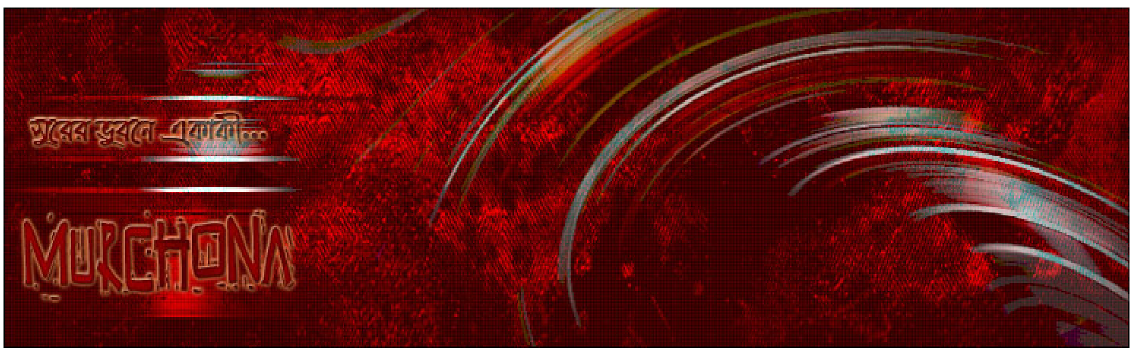
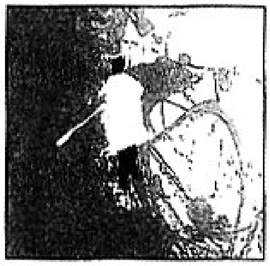
Angul Kata Jaglu by Humayun Ahmed




আঙুল কাটা জগলু
হুমায়ূন আহমেদ



স্থান : ফুলবাড়িয়া বাস টার্মিনালের নর্দমার ডান পাশ।

সময় : সন্ধ্যা হবে-হবে করছে।

মাস : আষাঢ়ের শেষ কিংবা শ্রাবণের শুরু।

তারিখ : জানা নেই।

আমি হিমু, তাকিয়ে আছি আকাশের দিকে। কবিরা আকাশের মেঘ দেখে আপ্লুত হন। তবে তারা বাস টার্মিনালের নর্দমার পাশে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখেন না।

নর্দমার বিকট গন্ধ নাকে লাগছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি বলে মনে হচ্ছে, গন্ধটা আকাশ থেকে আসছে।

আকাশ মেঘে মেঘে অন্ধকার। মেঘের ভাব দেখে মনে হচ্ছে ঢাকা শহরে ঝাঁপিয়ে পড়ার ব্যাপারে সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, তবে ঠিক কখন ঝাঁপিয়ে পড়বে এই ব্যাপারে হিসাবনিকাশ করছে। বুঝতে চেষ্টা করছে সে কখন নামলে শহরের মানুষ সবচেয়ে বেশি ঝামেলায় পড়বে। মেঘেদের মন-মেজাজ আছে। তারা রহস্য করতে পছন্দ করে।

ভাইজান, কী দেখেন?

কেউ-একজন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মোটামুটি বিস্মিত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করেছে। আমি আকাশ থেকে দৃষ্টি ফেরালাম না।

ভাইজান কিন্তু অখনো আমার প্রশ্নের জবাব দেন নাই। আসমানের দিকে চাইয়া কী দেখেন?

আমি আকাশ থেকে দৃষ্টি নামিয়ে আমার সামনে যে-মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে তাকালাম।

আমার সামনে ছোটখাটো একজন মানুষ। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবার কথা। গরমের সময়ও তার গায়ে ফ্লানেলের ফুলশার্ট। জিনসের প্যান্ট। প্যান্টের পা অনেকখানি গোটানো। পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল। জিনসের প্যান্টের সঙ্গে স্পঞ্জের স্যান্ডেলের কম্বিনেশন গ্রহণযোগ্য। বৃষ্টি-বাদলায় স্পঞ্জের স্যান্ডেল খুব কাজে দেয়। যেটা গ্রহণযোগ্য না সেটা হলো স্পঞ্জের স্যান্ডেলের ফিতা দুটা দু রঙের। একটা সবুজ, একটা লাল।

একসময় স্পঞ্জের স্যান্ডেলের ফিতা আলাদা কিনতে পাওয়া যেত। ফিতা ছিঁড়ে গেলে বাজার থেকে নতুন ফিতা কিনে লাগানো হতো। এখন এই কাজ কেউ করে না। ফিতা ছিঁড়ে গেলে স্যান্ডেল ফেলে দিয়ে নতুন স্যান্ডেল কেনে। ওয়ানটাইম ইউজ। আমরা দ্রুত ওয়ানটাইমের দিকে এগুচ্ছি। এই অভ্যাস কি আমরা প্রকৃতির কাছ থেকে পেয়েছি? প্রকৃতিও এরকমই করে। একটা মেঘ একবার ব্যবহার করে ফেলে দেয়। আবার নতুন মেঘ তৈরি করে।

লোকটার গালে খোঁচা-খোঁচা পাকা দাড়ি। জর্দা দিয়ে পান খাওয়া অভ্যাস আছে। মুখ থেকে ভুরভুর করে জর্দার গন্ধ আসছে। অভাবী মানুষদের মতো গাল ভাঙা, চোখ চকচক করছে। অভাবী মানুষদের চোখ কেন জানি পশুদের চোখের মতো চকচক করে।

ভাইজান, আমার নাম মতি। মতি মিয়া।

লোকটা এখন হ্যান্ডশেকের জন্যে হাত বাড়াল। এরকম রুগ্ণ হাত আমি আগে দেখেছি বলে মনে পড়ল না। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আলাদা আলাদাভাবে মৃত্যু হবার ব্যবস্থা থাকলে বলতে পারতাম, মতি নামের লোকটার ডান হাতের মৃত্যু হয়েছে।

আমার নাম তো বলেছি, মতি মিয়া। এখন আপনার নাম কী, জানতে পারি?

আমি বললাম, জানতে পারেন। আমার নাম 'হি'।

মতি মিয়া অবাক হয়ে বলল, হি? হুদামুদা হি?

ঠিকই ধরেছেন। হুদামুদা হি। হিমু থেকে সংক্ষেপ করে হি। ভালো নাম ছিল হিমালয়। হিমালয় থেকে হিমু। হিমু থেকে হি। এরপর হবে। 'ি'। সংক্ষেপ করেই যাব।

সংক্ষেপ করবেন কীজন্যে?

বাংলাদেশ বিমানের বিজ্ঞাপন দেখেন না? পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে। আমাদের নামও ছোট হয়ে আসছে। আপনার নাম তো মতি? সংক্ষেপ করে ফেলুন। এখন থেকে আপনার নাম 'ম'।

ম?

জি 'ম'। হুদামুদা ম।

মতি মিয়ার মুখের চামড়া শক্ত হয়ে গিয়েছে। ভুরু গেছে কুঁচকে। মনে হচ্ছে সে রাগ সামলানোর চেষ্টা করছে। চেষ্টা পুরাপুরি সফল হলো না। রাগ থেকেই গেল। সে চাপা- গলায় প্রায় ফিসফিস করে বলল, আমার সাথে বাইচলামি করেন? এখন আমি আপনেরে যে-কথাটা বলব সেটা শুনলে বাইচলামি বন হইয়া যাইব। পাতলা পায়খানাও ছুটতে পারে।

আমিও মতি মিয়ার মতো গলা নিচু করে বললাম, কথাটা কী?

আপনের ডাক পড়ছে।

কে ডাকছে?

আঙুল-কাটা জগলু ভাই ডাকছে। আমি আপনেরে উনার কাছে নিয়া যাব। দৌড় দেওনের চিন্তা মাথা থাইক্যা দূর করেন। চাইরদিকে আমরার লোক আছে। আমার পিছে পিছে হাঁটেন। ডাইনে-বামে চউখ দিবেন না।

চউখ বন্ধ করে ফেলি, হাত ধরে ধরে নিয়ে যান।

বাইচলামি অনেক করছেন। আর না। আঙুল-কাটা জগলু ভাইরে চিনছেন তো? নাকি চিনেন নাই। পরিচয় দিব? পরিচয়ের প্রয়োজন আছে?

আমি না-সূচক মাথা নাড়লাম। জগলু ভাইয়ের পরিচয় লাগে না। উনি অতি পরিচিত ব্যক্তি। পত্রিকার ভাষায় শীর্ষ সন্ত্রাসী। বাংলাদেশ সরকার তাকে ধরিয়ে দিতে পারলে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছে। সন্ত্রাসী হলেও উনি শিক্ষিত। ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি-পাওয়া মানুষ। তাঁর পড়াশোনার বিষয় ইংরেজি সাহিত্য।

আঙুল-কাটা জগলু ভাইজান থাকেন কোথায়?

কথা না বইল্যা চুপেচাপে হাঁটেন। নো টক।

আমি বললাম, বেশি দূর হলে একটা রিকশা নিয়ে নেই। যে-কোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে।

মতি মিয়া কঠিন চোখে আমার দিকে তাকাল। সেই দৃষ্টি যে-কোনো মানুষকে ভড়কে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। দৃষ্টির কারণে এখন মতি মিয়ার

চেহারাই পালটে গেছে। সরল বোকা- বোকা চেহারার বাইরেও যে তার অন্য একটা চেহারা আছে, এটা দেখে ভালো লাগছে। মতি মিয়া হাঁটছেও দ্রুত। লম্বা লম্বা পা ফেলছে। মানুষ ছোট-খাট হলেও তার পা বেশ লম্বা।

ইজিচেয়ারে যিনি শুয়ে আছেন তিনিই কি আঙুল-কাটা জগলু ভাইজান? প্রথমেই চোখ গেল আঙুলের দিকে। আঙুল ঠিক আছে। শুধু ঠিক না, বেশ ভালোরকম ঠিক। লম্বা লম্বা সুন্দর আঙুল। হাতের সঙ্গে মানানসই। পামিস্টরা এই ধরনের হাতকে বলেন কনিকেল হ্যান্ড। কৌণিক হস্ত। এ-ধরনের হাতের মানুষেরা শিল্প-সাহিত্যের অনুরাগী হয়। তারা হয় কোমল অন্তঃকরণবিশিষ্ট ভাবুক মানুষ।

উনার বাঁ হাতের মধ্যমায় সবুজ পাথরের আংটি। গায়ে কাজ-করা পাঞ্জাবি। পরনে সবুজ রঙের এক কালারের লুঙ্গি। তাঁর টাইপের লোকজন লুঙ্গি পরে আয়েশি ভঙ্গিতে ইজিচেয়ারে শুয়ে আছে ভাবতে কেমন যেন লাগে। এদের তো টেনশনে অস্থির হয়ে থাকার কথা। 'দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি' টাইপ ব্যাপার। পালাতে হবে কিংবা এক্ষুনি অ্যাকশনে যেতে হবে।

মতি ধাক্কা দিয়ে আমাকে কয়েক হাত এগিয়ে দিয়ে চাপাগলায় বলল, ওস্তাদ মাল আনছি।

জগলু ভাই চোখ তুলে একবার আমাকে দেখেই চোখ বন্ধ করে ফেললেন। মানুষটার চোখ সুন্দর, চেহারা সুন্দর। মাথাভরতি চুল। প্যাকেজ নাটকে নায়কের বড় ভাই চরিত্র দেওয়া যায় ধরনের চেহরা। যে বড় ভাই হয় ব্যাংকে কাজ করেন কিংবা কলেজের প্রফেসর। দুই মেয়ে এবং স্ত্রী নিয়ে সংসার। একটা বড় খাটে স্বামী-স্ত্রী ঘুমান, বাচ্চা দুটো তাদের মাঝখানে থাকে। আমি জগলু ভাইয়ের বয়স আঁচ করার চেষ্টা করছি। কত হতে পারে? চল্লিশ?

মতি মিয়া বলল, নাম জিজ্ঞাস করলাম। বলতেছে নাম হি। বাইচলামি করে।

জগলু ভাই একপলকের জন্যে চোখ মেলেই বন্ধ করে ফেললেন। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, তোকে নাম জিজ্ঞাস করতে বলি নাই। ধরে আনতে বলেছি। তুই সামনে থেকে যা।

মতি মিয়া সামান্য ধমকেই ভয়ে কুঁকড়ে গেল। দ্রুত ঘর থেকে বের

হতে গিয়ে দরজায় বাড়ি খেল। 'উফ' বলে চাপা আওয়াজ করল। জগলু ভাই চোখ খুললেন না। চোখ বন্ধ অবস্থাতেই পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেট বের করলেন। ঠোঁটে সিগারেট দিলেন। দেয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালেন। চোখ বন্ধ অবস্থায় দেয়াশলাই জ্বালানো বেশ কঠিন কাজ। দুই হাতে ভালো সিনক্রোনাইজেশনের প্রয়োজন হয়। শুধুমাত্র অন্ধরাই এই কাজটা পারে।

জগলু ভাই আমার দিকে হাত দিয়ে ইশারা করলেন। ইশারার অর্থ বসো কিংবা বসুন। মুখের কথায় আপনি-তুমি হয়। ইশারায় হয় না। আমি জগলু ভাইয়ের সামনে রাখা কাঠের চেয়ারে বসলাম। চেয়ারে বসা ঠিক হচ্ছে কি না বুঝতে পারছি না। জগলু ভাই হয়তো আমাকে মেঝেতে বসতে বলেছেন। এখন এই ঘরে শুধু আমি এবং জগলু ভাই।

মাঝারি ধরনের ঘর। আসবাবপত্র বলতে কয়েকটা কাঠের চেয়ার। একটা নিচু টেবিল। পুরনো আমলের হাতলওয়ালা ইজিচেয়ার। ঘরটার মধ্যে মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত ভাব আছে, তবে বেশ বড় ফ্ল্যাটস্ক্রিন টিভি আছে। টিভির সঙ্গে ডিভিডি প্লেয়ার লাগানো। জগলু ভাই সম্ভবত টিভি দেখতে পছন্দ করেন। এমন হতে পারে, কোনো-একটা বিশেষ সিরিয়াল তিনি খুব মন দিয়ে দেখেন। একটাও মিস করেন না।

তাঁর একটা ইন্টারভিউ নিতে পারলে ভালো হতো। শীর্ষ সন্ত্রাসী আঙুল-কাটা জগলু ভাই বিষয়ে মানুষজন জানতে পারত।

প্রশ্ন : জনাব আপনার প্রিয় টিভি প্রোগ্রাম কোনটি?

উত্তর : কৌন বনেগা ক্রোড়পতি।

প্রশ্ন : আপনার প্রিয় রঙ?

উত্তর : সবুজ।

প্রশ্ন : আপনার প্রিয় লেখক?

উত্তর : শেক্সপিয়ার।

জগলু ভাই চোখ মেলেছেন। আধশোয়া অবস্থা থেকে তিনি এখন বসা অবস্থানে এসেছেন। আগের সিগারেট শেষ হয়ে গেছে, এখন তিনি দ্বিতীয় সিগারেট ধরাচ্ছেন। চোখ খোলা অবস্থায় দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাতে তাঁর বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। এই কাজটা তিনি মনে হয় চোখ বন্ধ অবস্থাতেই ভালো পারেন।

তিনি বললেন (আমার দিকে না তাকিয়ে), তোমার নাম হি?

আমি বললাম, সংক্ষেপে হি। হিমু থেকে হি।

সংক্ষেপ কে করেছে?

আমিই করেছি।

কেন?

এখন সংক্ষেপের জমানা। সবকিছু সংক্ষেপ হয়ে যাচ্ছে। এইজন্যে নামটাও সংক্ষেপ করলাম।

সবকিছু সংক্ষেপ হয়ে যাচ্ছে মানে কী? কী সংক্ষেপ হচ্ছে?

মানুষের জীবন। যে-ছেলের বাঁচার কথা আশি বছর সে বিশ বছর বয়সে বোমা খেয়ে রাস্তায় পড়ে গেল।

তোমার ঝোলার ভেতর কী?

তেমন কিছু না।

ঝোলা উপুড় করে মেঝেতে ধরো। দেখি কী আছে।

জগলু ভাই বেশ আগ্রহ নিয়ে ঝুঁকে এসেছেন। তিনি মনে হয় ভাবছেন, ইন্টারেস্টিং কিছু বের হবে। ইন্টারেস্টিং কিছু বের হবার কথা না। ঝোলাতে কী আছে আমি নিজেও অবিশ্যি ভুলে গেছি। আমি নিজেও আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছি।

আমি ঝোলা উপুড় করলাম। দুটা বলপয়েন্ট বের হলো। একটা খাতা বের হলো। আর বের হলো গ্লাকোজ বিস্কিটের প্যাকেট। প্যাকেট খোলা। আমি কয়েকটা খেয়েছি, বাকি সব প্যাকেটে আছে। জগলু খুব সাবধানে বিস্কিটের প্যাকেট হাতে নিলেন। একটা একটা করে বিস্কিট বের করছেন, শুঁকে দেখছেন মেঝেতে ফেলছেন। প্রতিটি বিস্কিট দেখা শেষ হবার পর খাতাটা হাতে নিলেন। সেটিও শুঁকে দেখে রেখে দিলেন। উনার বোধহয় কুকুর- স্বভাব। সব জিনিস শুঁকে দেখতে হয়।

তুমি পুলিশের ইনফরমার?

জি না।

পুলিশের ইনফরমার না হলে আমার পিছনে পিছনে ঘুরছ কেন? গত এক সপ্তাহে আমি পাঁচবার তোমাকে আমার আশপাশে দেখেছি। তোমাকে লোকেট করা সহজ। হলুদ পাঞ্জাবি দেখেই তোমাকে আমি চিনি।

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, জগলু ভাই, আমি পুলিশের ইনফরমার

হলে প্রতিদিন হলুদ পাঞ্জাবি পরে আপনাকে খুঁজতাম না। একেক দিন একেক পোশাক পরতাম।

তুমি কি মজিদের লোক?

কোন মজিদ বলুন তো! এক মজিদকে চিনি, ঠেলাওয়ালা। ঠেলা চালায়।

আর কোনো মজিদকে চেন না?

জি না।

বোমা মজিদের নাম শুনেছ?

জি না। উনি নিশ্চয়ই আপনার মতো বিখ্যাত না। আপনার মতো বিখ্যাত হলে নাম শুনতাম।

তুমি পুলিশের ইনফরমারও না, আবার মজিদের লোকও না?

জি না।

জগলু ভাই আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। একজন অতি ভয়ঙ্কর ক্রিমিনাল; তার চোখের দৃষ্টি কঠিন হবার কথা। দৃষ্টি সেরকম না। চোখের দৃষ্টিতে প্রশ্রয়-প্রশ্রয় ভাব আছে।

তাঁর চোখের দৃষ্টির ওপর ভরসা করেই বললাম, জনাব, আপনাকে একটা প্রশ্ন কি করব? ব্যক্তিগত কৌতূহল।

কী প্রশ্ন?

আপনার আঙুল তো ঠিক আছে। আপনার নাম আঙুল-কাটা জগলু কেন?

আমি অন্যের আঙুল কাটি।

সব আঙুল কেটে দেন, না একটা-দুটা কাটেন?

তিনি আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ঠাণ্ডা গলায় ডাকলেন, মতি!

মতি মিয়া ঝড়ের বেগে ছুটে এল। ঘরে ঢুকতে গিয়ে আবার দরজার সঙ্গে কলিসান। এই ব্যাচারার মনে হয় ধাক্কা রাশি। জগলু ভাই বললেন, চৌবাচ্চায় পানি আছে?

মতি বলল, অল্প আছে।

চৌবাচ্চা পানি দিয়ে ভরতি কর। একে নিয়ে যা, এক মিনিট করে মাথা পানিতে ডুবায়ে রাখবি। তারপর জিজ্ঞেস করবি সে কার লোক, কী সমাচার। তখন মুখে বুলি ফুটবে। আমার ধারণা মজিদের লোক।

জলচিকিৎসাতে যদি কাজ না হয় সকালে বাঁ হাতের কানি আঙুলটা কেটে দিস।

আমি বললাম, জগলু ভাই, এক মিনিট করে চুবায়ে রাখলে জলচিকিৎসায় কাজ হবে না। আমি ডুব দিয়ে দেড় মিনিট থাকতে পারি।

আমার রসিকতা করার চেষ্টায় জগলু ভাই বিভ্রান্ত হলেন না। হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর মতো ভঙ্গি করলেন। ভাবটা এরকম যেন আমার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া শেষ।

মতি মিয়া আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তার মুখভরতি হাসি। মনে হয় পানিতে মাথা চোবানো এবং আঙুল কাটা এই দুটি কাজেই সে আনন্দ পায়। বর্তমান সময়ে মানুষের প্রধান সমস্যা কাজ করে আনন্দ না-পাওয়া। মতি মিয়া পাচ্ছে। তার জব স্যাটিসফেকশন আছে। এটা খারাপ কী?

আমি এখন আছি চৌবাচ্চাঘরে। মোগল আমল হলে বলতে পারতাম হাম্মামখানা। জানালাবিহীন ঘর। একটাই দরজা। ঘরের এক কোণে চৌবাচ্চা। ট্যাপ খোলা হয়েছে। চৌবাচ্চায় পানি দেওয়া হচ্ছে। আমার সঙ্গে এক প্রৌঢ়ও আছেন। তাঁর হাত বাঁধা। প্রথম যখন ধাক্কা দিয়ে আমাকে এই ঘরে ঢোকানো হয়, তখন অন্ধকারের কারণে প্রৌঢ়ের মুখ দেখতে পাইনি। এখন চোখে অন্ধকার সয়ে এসেছে। প্রৌঢ়কে দেখতে পাচ্ছি।

দীর্ঘদিন ব্যালান্সড্ ডায়েট খাওয়া চেহারা। চব্বিশ ঘণ্টা এসি রুমে থাকলে চামড়ায় তেলতেলা যে ভাব আসে, তা এসেছে। পরনে ফতুয়া ধরনের পোশাক। জিনিসটিতে জটিল সুচের কাজ করা হয়েছে, অর্থাৎ দামি পোশাক। তবে ভদ্রলোক চুপসে গেছেন। তাঁর দামি ফুতুয়া ঘামে ভেজা। তিনি ক্রমাগত নড়াচড়া করছেন। ঘরে আমরা দুইজন। দরজা বাইরে থেকে তালাবদ্ধ। দরজার ফাঁক দিয়ে কিছু আলো আসছে। আলোর একটা রেখা প্রৌঢ়ের মাথার ঠিক মাঝখানে পড়েছে। নাক এবং ঠোঁটের মাঝখান আলো হয়ে আছে। বাকিটা অন্ধকার। ফেলিনি কিংবা বার্গম্যানের মতো পরিচালক থাকলে এই লাইটিং দেখে মজা পেতেন।

তালাবদ্ধ দরজার বাইরে লোকজন হাঁটাহাঁটি করছে বোঝা যাচ্ছে। একবার ঘড়ঘড় শব্দ হলো। মনে হচ্ছে কেউ ভারী কিছু টেনে আনছে।

ঘড়ঘড় শব্দে প্রৌঢ় ভদ্রলোক এমনভাবে কেঁপে উঠলেন যেন ট্যাঙ্ক আসছে। এক্ষুনি তাঁর দিকে কামান তাক করে গুলি করা হবে। তিনি রাজহাঁস টাইপ ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললেন, কী ব্যাপার? শব্দ কিসের? প্রশ্নটা তিনি আমার দিকে তাকিয়ে করলেন।

আমি বললাম, মনে হয় ট্যাঙ্ক। ছোট ছোট রাশিয়ান ট্যাঙ্ক যখন চলে এরকম শব্দ হয়। *ব্যালাড অব এ সোলজার* ছবিতে এরকম শব্দ শুনেছি।

ভদ্রলোক মোটামুটি কঠিন গলায় বললেন, তুমি কে?

প্রথম আলাপেই সরাসরি তুমি। বোঝা যাচ্ছে, এই লোক তুমি বলেই অভ্যস্ত। শিক্ষকরা যেমন যাকে দেখে তাকেই ছাত্র মনে করে, এই লোকও যাকে দেখে তাকেই মনে হয় কর্মচারী মনে করে। আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বিনীত গলায় বললাম, স্যার আমার নাম জানতে চাচ্ছেন? আমার নাম হিমু। ইদানীং সংক্ষেপ করে বলছি হি।

তোমাকে এরা ধরেছে কীজন্যে?

আঙুল কাটার জন্যে ধরে নিয়ে এসেছে স্যার। ওস্তাদ জগলু ভাই মানুষের আঙুল কাটতে পছন্দ করেন শুনেছেন বোধহয়। আপনার আঙুল যেমন কাটবে আমারটাও কাটবে। জগলু ভাইয়ের কাছে গরিব-ধনী সমান। স্যার, আপনার পরিচয়টা কি জানতে পারি? আপনার কিসের ব্যবসা?

আমি মনসুর গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক। আমার নাম মনসুর খান।

শুনে ভালো লাগল স্যার। আমার হাত বাঁধা। হাত খোলা থাকলে আপনার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতাম। আপনাদের মতো লোকদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে পারা ভাগ্যের ব্যাপার। আপনাকে ধরেছে কীজন্যে?

টাকা চায়। বিশ লাখ টাকা চায়।

দিয়ে দেন। বিশ লাখ টাকা তো আপনার হাতের ময়লা। আপনার একটা আঙুলের দাম নিশ্চয়ই বিশ লাখের বেশি।

টাকা দিয়ে দিতে বলেছি। সম্ভবত এর মধ্যে দিয়েও দিয়েছে।

তা হলে তো স্যার আপনি রিলিজ নিয়ে চলে যাচ্ছেন।

আই হোপ সো। এরা চৌবাচ্চায় পানি দিচ্ছে কেন?

আমার জন্যে জলচিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। জগলু ভাই অর্ডার দিয়েছেন চৌবাচ্চা ভরতি হলে এক মিনিট করে যেন আমার মাথা চৌবাচ্চায় ডুবানো হয়। পেট থেকে কথা বের করার পদ্ধতি।

বলে কী তোমার কথাবার্তা শুনে তো মনে হচ্ছে না তুমি ভয় পাচ্ছ।

আমি বললাম, ভয় পেলে যদি কোনো লাভ হতো তা হলে ভয় পেতাম। লাভ যখন হবে না, শুধুশুধু ভয় পাওয়ার দরকার কী? স্যার, আপনি পানিতে ডুব দিয়ে কতক্ষণ থাকতে পারেন?

কেন?

কিছুই তো বলা যায় না, ধরেন আমাকে বাদ দিয়ে আপনাকে পানিতে চুবানো শুরু করল।

আমি তো তোমাকে বলেছি তারা যা চেয়েছে সেটা দিতে বলেছি। আমি এখন রিলিজ নিয়ে চলে যাব। আমি আর দেশেই থাকব না। কানাডায় ইমিগ্রেশন নেওয়া আছে, মেয়েকে নিয়ে চলে যাব কানাডা।

আপনার মেয়ের নাম কী?

আমার মেয়ের নাম দিয়ে তোমার দরকার কী?

স্যার, আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন?

তুমি ফালতু কথা বলছ কেন?

ঠিক আছে স্যার, আর কথা বলব না, একটা ছোট্ট উপদেশ দেই? বিপদে উপদেশ কাজে লাগতে পারে।

ফাজিল! চুপ, উপদেশ দিতে হবে না।

গালাগালি করছেন কেন স্যার? আমার উপদেশটা শুনে রাখুন—পানিতে যখন মাথাটা চুবাবে নিশ্বাস নিবেন না, হাঁ করবেন না, নড়াচড়া করবেন না। ভয়ে যদি নিশ্বাস নিয়ে ফেললেন, বিরাট বিপদ হবে। নাক দিয়ে পানি ঢুকলে সমস্যা। পানি ঢুকে যাবে ফুসফুসে। জীবন-সংশয় হবে। দেড়-দুই মিনিট নিশ্বাস বন্ধ করে থাকা খুবই কষ্টকর, তবে অসম্ভব না। *গিনেস বুক অব রেকর্ডসে* তিন মিনিট পানিতে ডুব দেবার কথা আছে।

ভদ্রলোক ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, চুপ বললাম, চুপ।

আমি মধুর ভঙ্গিতে বললাম, চেষ্টা করবেন শান্ত থাকতে। শান্ত থাকলে শরীরের অক্সিজেনের প্রয়োজন কিছুটা কমে।

তুই শান্ত থাক। তুই অক্সিজেনের পরিমাণ কমা।

তুইতোকারি করছেন কেন স্যার? আমরা দুইজন একই পথের পথিক। জলচিকিৎসার রোগী। আমাদের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা...

চুপ।

ভদ্রলোক হয়তো আরো হইচই করতেন। সুযোগ পেলেন না, দরজা খুলে গেল। মতি মিয়া ঢুকল। চৌবাচ্চার পানি পরীক্ষা করল। চৌবাচ্চা এখনো ভরতি হয়নি। আমি প্রৌঢ়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, চৌবাচ্চাটা ভরতি হতে এতক্ষণ লাগছে কেন বুঝলাম না। মনে হয় কোনো ফুটো আছে। স্যার, আপনি কি চৌবাচ্চার অঙ্ক জানেন—একটা নল দিয়ে পানি ঢুকে আরেকটা দিয়ে চলে যায়?

প্রৌঢ় আগের মতো গলাতেই ধমক দিলেন, চুপ!

আমি চুপ করলাম। মতি মিয়া এখন প্রৌঢ়ের দড়ির বাঁধন খুলছে। খুলতে খুলতেই বলল, আপনার জন্যে সুসংবাদ। এখন চলে যাবেন। ওস্তাদ আপনাকে ছেড়ে দিতে বলেছে। চউখ বান্দা অবস্থায় মাইক্রোবাসে তুলব। দূরে নিয়ে ছেড়ে দিব। রিকশা নিয়ে চলে যাবেন।

প্রৌঢ় বললেন, থ্যাঙ্ক য়্যু।

মতি মিয়া বলল, আপনার তকলিফ হয়েছে, কিছু মনে নিবেন না।

কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে।

আপনার ভাগ্য ভালো, আপনে অল্পের ওপর পার পাইছেন।

প্রৌঢ় আমার দিকে শেষ তাকানো তাকিয়ে ঘর থেকে বের হলেন। একে অবিশ্যি তাকানো বলা যাবে না। তিনি তীরনিক্ষেপের মতো দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন বলা চলে।

আকাশে মেঘ ডাকছে। যে-মেঘের নামার কথা ছিল সেই মেঘ তা হলে এখনো নামেনি। বৃষ্টি নামার আগের মেঘের ডাকের সঙ্গে বৃষ্টি নামার পরের মেঘের ডাকের সামান্য পার্থক্য আছে। রূপা নামের এক তরুণী আমাকে এই পার্থক্য শিখিয়েছিল। আমি শিখিয়েছি আমার খালাতো ভাই বাদলকে। মেঘবিদ্যা পুরোপুরি নষ্ট হতে দেওয়া ঠিক না। বাদল এই বিদ্যার চর্চা করছে কি না জানি না। অনেক দিন তার সাথে দেখা হয় না। ইদানীং সে কিছু ঝামেলার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। কী-একটা গান তার মাথায় ঢুকে গেছে। সে যেখানে যায়, যা-ই করে তার মাথায় একটা গানের লাইন বাজে। বড়ই অদ্ভুত গানের কথা। প্রথম লাইনটা হচ্ছে, 'নে দি লদ বা রয়াওহালা গপা।' সমস্যা হচ্ছে এই গান নাকি সে আগে কখনো শোনেনি। যে গান সে কোনোদিন শোনেনি সেই গান কী করে তার মাথায় ঢুকল কে

জানে! তার মাথা থেকে কি গান দূর হয়েছে? একটা টেলিফোন হাতের কাছে থাকলে বাদলকে জিজ্ঞেস করতে পারতাম। থানাওয়ালাদের হাতে যখন ধরা খেয়েছি তখন তারা মাঝেমধ্যে টেলিফোন করতে চাইলে দিত। বেশির ভাগ সময়ই অবিশ্যি দেখা যেত তাদের টেলিফোন কাজ করে না। ডায়ালটোন আসে না, আর যদিও আসে শোঁশোঁ আওয়াজ হয়। বাংলাদেশে বেশির ভাগ সময় দুই জায়গার টেলিফোন নষ্ট থাকে—পুলিশের টেলিফোন এবং হাসপাতালের টেলিফোন। এদেরকে কি জিজ্ঞেস করে দেখব একটা টেলিফোন করতে দিবে কি-না।

বন্ধ দরজা ধড়াম করে খুলে গেল। চার-পাঁচজনের একটা দল প্রবেশ করল। দলের পুরোভাগে জগলু ভাই আছেন। এবং আমাদের প্রৌঢ়—মনসুর গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক মনসুর খাঁ সাহেবও আছেন। তাঁর মুখ ঝুলে পড়েছে। এবং তিনি হাঁপানি রোগীদের মতো টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছেন।

ঘটনা আঁচ করতে পারছি। বিশ লক্ষ টাকা জায়গামতো পৌঁছেনি। মনসুর সাহেবের মেয়ে হয়তো পুলিশে খবর দিয়েছে। সাদা পোশাকের পুলিশ একটা বেড়াছেড়া বাধিয়েছে। কিংবা টাকার বদলে সুটকেসভরতি পুরনো খবরের কাগজ পাঠিয়ে দিয়েছে। তার বাবা যে কত বড় বিপদে আছে সে বোধহয় আঁচ করতে পারছে না।

জগলু ভাইয়ের হাতে সিগারেট। তিনি ঘনঘন সিগারেট টানছেন। যতবারই টানছেন ততবারই আড়চোখে তাঁর রিস্টওয়াচের দিকে তাকাচ্ছেন। এই প্রথম তাঁর মধ্যে উত্তেজনা লক্ষ করলাম। উত্তেজনায় তাঁর নাক ঘামছে। সমুদ্রবিদ্যা বইয়ে আছে, মানসিক উত্তেজনাকালে যে-পুরুষের নাক ঘামে সে স্ত্রী-সোহাগী হয়। জগলু ভাই কি স্ত্রী-সোহাগী?

জগলু ভাই বললেন, বুড়ার মাথা পানিতে চুবাও। তার আগে বদমাইশের মেয়েটাকে মোবাইল টেলিফোনে ধরো। বুড়ার মাথা পানি থেকে তোলার পর টেলিফোনটা বুড়ার হাতে দাও। বুড়া মেয়ের সঙ্গে কথা বলুক। ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ দেখেনি। আমার সঙ্গে টালটুবাজি?

টেলিফোনে মেয়েকে ধরতে ঝামেলা হলো। নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না। যখন নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় তখন মেয়ের টেলিফোন থাকে বিজি। এদিকে সময় চলে যাচ্ছে। জগলু ভাইয়ের রাগ ক্রমেই বাড়ছে। চৌবাচ্চা

পূর্ণ। এক্ষুনি হয়তো পানি উপচে পড়বে।

জগলু ভাই বললেন, কী, লাইন পাওয়া গেছে?

মতি মিয়ার হাতে টেলিফোন। সে ভীত গলায় বলল, জি না।

একটা কানেকশন ঠিকমতো করতে পারো না? নাম্বার জানো? বোতাম ঠিকমতো টিপছ? টিলিফোন হারুনের কাছ দাও। তুমি জীবনে কোনো-একটা কাজ ঠিকমতো করতে পেরেছ বলে আমার মনে পড়ে না।

হারুনের পারফরমেন্স মতি মিয়ার চেয়েও খারাপ। সে বোতাম টেপার আগেই মোবাইল সেট হাত থেকে ফেলে দিল। সেট সে মেঝে থেকে অতি দ্রুত তুলল। ঝড়ের গতিতে বোতাম টিপল। ছয়-সাত বার 'হ্যালো, হ্যালো' বলল, লাভ কিছু হলো না।

জগলু ভাই বললেন, কী হলো? এখনো লাইনে পাচ্ছ না?

হারুন কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, টেলিফোন অফ করে রেখেছে। রিং হয় ধরে না।

জগলু ভাই থমথমে গলায় বললেন, বেকুবের মতো কথা বলবে না। যে-মেয়ের বাপের এই অবস্থা, আমাদের সঙ্গে যেখানে তার যোগাযোগের একমাত্র ব্যবস্থা টেলিফোন, সেখানে সে টেলিফোন অফ করে রাখবে? আমি কোনো বেকুব পছন্দ করি না, আর আমাকে চলতে হয় বেকুব নিয়ে।

এখন চৌবাচ্চা কানায় কানায় পূর্ণ। টেলিফোনে মেয়েটিকে ধরা যাচ্ছে না বলে চৌবাচ্চা কাজে লাগছে না। বাংলা ছবির কোনো দৃশ্য হলে এই অবস্থায় ব্যাকগ্রাউন্ডে সুপার টেনশন মিউজিক বাজত। মিউজিকের মধ্যে আফ্রিকান ড্রামের শব্দ—ড্রিম ড্রিম ড্রিম। এই ড্রিম ড্রিমের সঙ্গে হার্ট বিটের শব্দ মিশিয়ে মিশ্র মিউজিক।

আমি বললাম, জগলু ভাই, আমি কি ট্রাই করে দেখব? টেলিফোনে কানেকশন পাওয়ার লাক আমার খুব ভালো। সবসময় এক চান্সে লাইন পাই।

দলনেতা এবং দলের সদস্যরা সবাই একসঙ্গে আমার দিকে তাকাল। জগলু ভাইয়ের চোখ চকচক করছে। তাঁর সিগারেট নিভে গেছে। তিনি নেভা সিগারেটই টানছেন।

মতি বলল, ওস্তাদ, এইটারে আগে পানিত চুবাই। এই কুত্তা বড় দিগদারি করতেছে।

জগলু ভাই হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়তে গিয়েও নাড়লেন না। শেষমুহূর্তে মত বদলে বললেন, এর হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে এর হাতে টেলিফোন দে।

আমি বললাম, নাম্বারটা দিন।

টেলিফোন হাতে নিয়ে যে ভীতমুখে দাঁড়িয়ে আছে—হারুন ভাইজান—সে বলল, রিডায়ালে টিপলেই হবে।

আমি বললাম, রিডায়ালে টিপলে হবে না হারুন ভাই। একেকজনের একেক সিস্টেম। আমি রিডায়ালের লোক না। আমি ডাইরেক্ট ডায়ালের লোক। নাম্বারটা বলুন।

হারুন ভাইজান নাম্বার বললেন। আমি বোতাম টিপলাম। সেট কানে লাগানোর আগে মনসুর খাঁ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললাম, মেয়েটার নাম কী? খাঁ সাহেবের মুখ আরো ঝুলে গেছে। তিনি এমনভাবে তাকাচ্ছেন যেন প্রশ্ন শুনতে পাননি।

স্যার, আপনার মেয়েটার নাম বলুন।

মিতু।

মিস না মিসেস?

মিস না মিসেস দিয়ে কোনো দরকার আছে?

অবশ্যই দরকার আছে। হ্যালো মিস মিতু বলব না হ্যালো মিসেস মিতু বলব জানাতে হবে না?

ওর বিয়ে হয়নি।

বয়স কত?

বয়স দিয়ে কী হবে?

কোন বয়সের মেয়ে সেটা হিসাব করে কথা বলতে হবে না?

উনিশ।

জগলু ভাই আমার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় বললেন, তোমার কথা বলার কিছু নাই। তুমি লাইন ধরে দাও। প্রথমবারে যদি না পাও আমি স্ট্রেইট তোমাকে পানিতে চুবাব। তোমার রস বেশি হয়েছে। রস বের করে রস দিয়ে গুড় বানায়ে দিব। আসার পর থেকে ফাজলামি করেই যাচ্ছ। আমি দেখতে চাই তুমি কতক্ষণ ফাজলামি করতে পার।

প্রথম চেষ্টাতেই লাইন পাওয়া গেল। অতি মিষ্টি গলায় একটি মেয়ে বলল, হ্যালো।

আমি বললাম, মিতু, ভালো আছ?

আপনি কে?

আমাকে তুমি চিনতে পারবে না। আমার নাম হিমু। সংক্ষেপ হি।

কী চান আপনি?

ধমক দিয়ে কথা বোলো না মিতু। আমি জগলু ভাইয়ের আপনা লোক। জগলু ভাই আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। তোমার কথা উনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন। জগলু ভাইকে চিনতে পারছ তো? আঙুল-কাটা জগলু। কঠিন বস্তু। কচাকচ আঙ্গুল কাটনেওয়ালা।

মিতুর আর কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে সে নিজেকে সামলানোর জন্যে সময় নিচ্ছে। আমি হাত দিয়ে রিসিভার চাপা দিয়ে জগলু ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, ওস্তাদ, আপনি কথা বলবেন? নাকি প্রাথমিক আলাপ আমিই করব?

জগলু ভাইও কিছু বলছেন না। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার চোখে। মনে হচ্ছে তিনি পলক ফেলছেন না। কাজেই আমি আবারও টেলিফোন কানে নিলাম।

হ্যালো মিতু। তোমরা কাজটা ঠিক করনি। বিশ লাখ টাকা তোমাদের কাছে এমন কোনো টাকা না। সেই টাকা নিয়ে তোমরা ভাঁওতাবাজি করলে। ওস্তাদ খুব রাগ হয়েছেন। এখন আমরা তোমার বাবাকে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট দেব। আয়োজন সম্পন্ন, এখন উনার মাথা পানিতে চুবানো হবে। পরপর তিনটা দেড় মিনিটের সেশন হবে।

বাবা কি আপনার আশপাশে আছে?

অবশ্যই আছেন। জলচিকিৎসার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

বাবাকে দিন।

এখন তো উনাকে দেয়া যাবে না। প্রথম ডোজ ওষুধ পড়ার পর দেয়া হবে।

প্রথম ডোজ ওষুধ মানে?

প্রথম ডোজ ওষুধ মানে প্রথমবার পানিতে চুবানো। জলচিকিৎসার পর আমরা কী করব শোনো, শল্যচিকিৎসা। উনার একটা আঙুল কেটে কুরিয়ার সার্ভিসে তোমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তবে শেষ সুযোগ এখনো

আছে। টাকাভরতি সুটকেস হাতের কাছে রাখো। প্রথমবার আমাদের সঙ্গে টালটুবাজি করেছ বলেই এই দফায় টাকার পরিমাণ কিছু বেড়েছে। এখন হয়েছে পঁচিশ লাখ। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে টাকা নিতে আসছি। দারোয়ানকে আমার কথা বলে রাখো। বলামাত্রই যেন গেট খুলে দেয়। ভালো কথা, তোমাদের বাড়িতে কুকুর নেই তো? কুকুর থাকলে আমি যাব না। অন্য লোক যাবে। আমি কুকুর ভয় পাই।

আপনি বাবাকে টেলিফোন দিন।

একটু দাঁড়াও, ওস্তাদ জগলু ভাইকে জিজ্ঞেস করে দেখি তিনি পারমিশন দেন কি না। লিডারের পারমিশন ছাড়া টেলিফোন দিতে পারব না। উনি আমাদের লিডার।

জগলু ভাই চোখের ইশারায় অনুমতি দিলেন। আমি টেলিফোন মনসুর সাহেবের কানে ধরলাম। তিনি কোনো কথা বলতে পারলেন না। হেঁচকি তুলে কাঁদতে লাগলেন। ওপাশ থেকে মেয়ের কথা শোনা যাচ্ছে, কে, বাবা? বাবা? হ্যালো। প্লিজ কুল ডাউন। তোমাকে রিলিজ করার জন্যে যা করার করব। কুল ডাউন বাবা। কুল ডাউন।

আমরা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে গেছি। চৌবাচ্চা সামনে রেখে দুজন বসে আছি। আমার দৃষ্টি চৌবাচ্চার দিকে। মনসুর সাহেব তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। দরজা বাইরে থেকে তালাবদ্ধ, তবে দরজার ফাঁক দিয়ে আলো আসছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই অন্ধকারে আছি বলে চোখ সয়ে আছে। আমি মনসুর সাহেবের মুখ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আমেরিকার এক বিখ্যাত প্রেসিডেন্টের চেহারার সঙ্গে তাঁর চেহারার সুসাদৃশ্য আছে। প্রেসিডেন্টের নাম আব্রাহাম লিংকন।

মনসুর সাহেবের মনে হয় হাঁপানি নামক ব্যাধি ভালোভাবেই ধরেছে। নিশ্বাসই নিতে পারছেন না। অবস্থা যা তাঁকে পানিতে চোবানোর আগেই তিনি মারা যাবেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম, হাঁপানির জন্যে আপনি কি কখনো লোকজ কোনো চিকিৎসা করিয়েছেন?

কী চিকিৎসা?

লোকজ চিকিৎসা। শিয়ালের মাংস খেলে হাঁপানি সারে বলে শুনেছি। খেয়েছেন শিয়ালের মাংস?

মনসুর সাহেব বললেন, আমি চরম দুঃসময়ের মধ্যে যাচ্ছি, এর মধ্যে তুমি এরকম ঠাট্টা-ফাজলামি কথা বলতে পারছ?

যদি উদ্ধার পেয়ে যান তা হলে তো আর আপনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হবে না। তখন মনে করে শিয়ালের মাংস খাবেন। মাটন বিরিয়ানি স্টাইলে বাবুর্চিকে রাঁধাতে বলবেন। আসলে জিনিসটা হবে ফক্স বিরিয়ানি। শিয়ালের গন্ধ মারার জন্যে বেশি করে এলাচি দিতে বলবেন।

তুমি কি দয়া করে চুপ করবে?

হাঁপানির আরো একটা ভালো লোকজ চিকিৎসা আছে। এই চিকিৎসায় কোনোকিছু খেতে হবে না। চিকিৎসাটা বলব?

মনসুর সাহেব কঠিন চোখে তাকাচ্ছেন। আমি তাঁর দৃষ্টি অগ্রাহ্য করলাম।

এই চিকিৎসা যে আপনাকে করতেই হবে তা তো না। জানা থাকল। আপনি কী করবেন শুনুন, একটা জীবন্ত ছোট সাইজের তেলাপোকা ধরবেন। হ্যাঁ করে মুখের ভেতর রাখবেন। ঠোঁট বন্ধ করে দেবেন। তেলাপোকা মুখের ভেতর ফড়ফড় করতে থাকবে। মরবে না। কারণ, তার অক্সিজেনের অভাব হবে না। প্রতিদিন এই চিকিৎসা যদি একবার করে চালিয়ে যান, আপনি হবেন সম্পূর্ণ রোগমুক্ত।

মনসুর সাহেব আমার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে চৌবাচ্চার দিকে তাকালেন। চৌবাচ্চা থেকে পানি উপচে পড়ছে। ঝরনার মতো সুন্দর শব্দ হচ্ছে। মনসুর সাহেব চৌবাচ্চার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার নাম হি?

আমি বললাম, সংক্ষিপ্ত নাম হি। অনেকেই ডাকে হিমু। শুধু আমার বাবা আমাকে ডাকতেন হিমালয়।

হিমু শোনো। আমি তোমার কথাবার্তা, কর্মকাণ্ড কিছুই মিলাতে পারছি না। আমি জানতে চাচ্ছি তোমার কী ধারণা, এরা কি আমাকে মেরে ফেলবে?

আমি বললাম, এরা যদি বুদ্ধিমান হয় তা হলে মেরে ফেলবে। আর যদি বোকা হয় বাড়িতে ফেরত পাঠাবে।

জগলু বোকা না বুদ্ধিমান?

বুদ্ধিমান।

তা হলে সে আমাকে মেরে ফেলবে?

মেরে ফেলা উচিত, তবে বিরাট বুদ্ধিমানরা মাঝে মাঝে বোকামি করে। সেই বোকামিতে আপনি ছাড়া পেতে পারেন।

আর তোমাকে কী করবে?

আমাকে আপনার মেয়ের কাছে পাঠাবে সুটকেসভরতি টাকা নিয়ে আসতে।

তুমি এমনভাবে কথা বলছ যে, কী ঘটবে না-ঘটবে সবই তুমি জানো।

আমি হাসলাম। বিশেষ ধরনের হাসি— যে-হাসির নানান অর্থ করা যায়।

হিমু!

জি?

তোমার সঙ্গে কি ঘড়ি আছে, কয়টা বাজে বলতে পারো?

আমি বললাম, আমার সঙ্গে ঘড়ি নাই, তবে কয়টা বাজে বলতে পারি। আটটা পঁচিশ।

তালা খোলার শব্দ হচ্ছে। জগলু ভাই সঙ্গে এমন একজনকে নিয়ে ঢুকেছেন যাকে দেখামাত্র হার্টবিট বেড়ে একশো-একশো দশের মতো হওয়ার কথা। গামা পালোয়ান ধরনের কেউ না। সাধারণ স্বাস্থ্যের লম্বা একজন মানুষ। গায়ের রং ফরসা। ছোট ছোট চোখ। মাথার চুল সম্ভবত পাকা, মেন্দির রং দিয়ে লাল করা হয়েছে। মানুষটার চেহারার সবকিছুই স্বাভাবিক, কিন্তু সব স্বাভাবিকতার বাইরে এমন ভয়ঙ্কর কিছু আছে যা সরাসরি বুকে ধাক্কা দেয়।

জগলু ভাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মেয়েটার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সে বলেছে আর সমস্যা হবে না। কাউকে পাঠালে টাকা দিয়ে দিবে। আমরা ঠিক করেছি তুমি গিয়ে টাকা নিয়ে আসবে। আমার নিজের লোক কেউ যাবে না।

আমি বললাম, স্যার, আমি একা যাব?

হ্যাঁ একাই যাবে। দূর থেকে আমার লোকজন তোমাকে ফলো করবে। টালটুবাজি করার সুযোগ নেই।

মিতুর সঙ্গে একটু কথা বলে নেই। টেলিফোনে তার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিন।

তার সঙ্গে তোমার কথা বলার কিছু নেই।

অবশ্যই আছে। আমার কিছু জিনিস জানতে হবে। আমি তাদের বাড়িতে ঢুকলাম আর ধরা খেয়ে গেলাম এটা কি ঠিক হবে? তা ছাড়া এই বুড়া মিয়ার ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মনসুর সাহেবের কথা বলছি।

তার বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত?

তাকে আমরা কখন খুন করব? আমি রওনা হবার আগেই, না টাকা নিয়ে ফিরে আসার পর?

এত চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। তোমার কাজ টাকাটা নিয়ে আসা।

জগলু ভাই, আমি ওই মেয়ের সঙ্গে কথা না বলে রওনাই হব না। আমি তিন কথার মানুষ।

তিন কথার মানুষ মানে?

আমি প্রতিটি কথা তিনবার করে বলি। দানে দানে তিন দান। তিন নম্বর কথা যেটা বলি সেটা ফাইনাল।

জগলু ভাই তাঁর হাতের মোবাইল এগিয়ে দিলেন। মিতুকে সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল। আমি বললাম, কেমন আছ মিতু?

মিতু বলল, আপনি কে?

আমার নাম হিমু, আমি জগলু ভাইয়ের আপনা লোক। তোমার সঙ্গে আগেও কথা হয়েছে। আমি টাকার সুটকেস নেবার জন্যে আসছি। টাকা রেডি তো?

হ্যাঁ রেডি।

গেটে বলে রাখবে। রিকশা করে দুজন লোক আসবে। রিকশা থামামাত্র যেন গেট খুলে দেয়।

বলে রাখা হবে।

কফির পানি গরম করে রাখবে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আসব তো! গরম এক কাপ কফি কাজে দেবে।

কফির ব্যবস্থা থাকবে।

স্ন্যাকস জাতীয় কিছু রাখতে পারবে? ভাজাভুজি ধরনের কিছু?

থাকবে।

কুকুর দূর করেছ? আমি আগেই বলেছি যে-বাড়িতে কুকুর আছে সে-বাড়িতে আমি যাই না।

কুকুর বেঁধে রাখা হয়েছে।

আমি বাঁধাবাঁধির মধ্যে নাই। অন্য বাড়িতে কুকুর পাঠিয়ে দিতে হবে।

আমার বাবা কোথায়? বাবাকে কখন ফেরত পাব?

উনাকে সঙ্গে নিয়ে আসব।

উনাকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন?

অবশ্যই। ফ্যালো কড়ি মাখো তেল অবস্থা। মাল ডেলিভারি দিয়ে টাকা নিয়ে চলে আসব। জগলু ভাইয়ের এইটাই সিস্টেম।

আমার কথা শেষ হবার আগেই জগলু ভাই খপ করে হাত থেকে টেলিফোন নিয়ে নিলেন। তাঁর মুখ সেগুন কাঠের মতো শক্ত। চোখ এখন মারবেলের মতো। তিনি সর্প স্টাইলে হিসহিস করে বললেন, মাল ডেলিভারি নিয়ে যাবে মানে? কী মাল?

মনসুর সাহেবকে নিয়ে যাব। তাকে তো এখন আমাদের দরকার নাই।

তাকে দরকার নাই এই গুরুত্বপূর্ণ খবর তোমাকে কে দিয়েছে?

আপনি চান আমি একা যাই?

অবশ্যই। আগে টাকা আসুক, তারপর বুড়োর ব্যাপারে কী করা যায় আমরা বিবেচনা করব।

আমি এর মধ্যে নাই।

কী বলতে চাও তুমি?

জগলু ভাই, আমি যেটা বলতে চাই পরিষ্কার করে বলব। মন দিয়ে শুনুন। আপনাদের দরকার টাকা। বুড়ো লোকটাকে আপনাদের দরকার নাই। টাকা আমি এনে দেব তবে বুড়োকে ফেরত দিতে হবে। রাজি থাকলে বলুন। রাজি না থাকলে আমাকে পানিতে চুবান।

জগলু ভাই তাঁর মারবেলের চোখে ইশারা করলেন। নিমেষের মধ্যে এরা আমাকে ঘাড় পর্যন্ত পানিতে চুবিয়ে ধরল।

শৈশবে এই পদ্ধতির ভেতর দিয়ে আমি গিয়েছি। আমার জ্ঞানী বাবা আমাকে এ ধরনের জলচিকিৎসা বেশ কয়েকবার করিয়েছেন। নিশ্বাস নিতে না পারার কষ্টটা অনুভব করার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি যা করতেন তা হলো, মাথা পানিতে চুবিয়ে উঁচু গলায় কথা বলতেন। পানির নিচে সেই কথা অন্যরকমভাবে কানে আসত। তাঁর কথাগুলো ছিল :

হে পুত্র। তুমি কঠিন অবস্থায় আছ। অক্সিজেন নামক

অতি ক্ষুদ্র কিছু অণুর জন্যে তোমার সমস্ত শরীর এখন ঝনঝন করছে। মানুষের মস্তিষ্ক অক্সিজেন সবচেয়ে বেশি বেশি ব্যবহার করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমার মস্তিষ্কের অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাবে। তখন মস্তিষ্ক স্বরূপে আবির্ভূত হবে। মস্তিষ্ক তোমাকে অদ্ভুত সব অনুভূতি দেখাবে, দৃশ্য দেখাবে। ভয় পেও না।

এখানে আমি বাবার কথা শুনতে পাচ্ছি না, তবে অন্যদের কথা শুনতে পাচ্ছি। মনসুর সাহেবের কান্না শুনতে পাচ্ছি। মতি নামের লোকটার কথা শুনতে পাচ্ছি। সে বিড়বিড় করে বলছে, ওস্তাদ, মনে হয় শেষ হয়ে গেছে। তুলব?

ব্যাঞ্জো টাইপ একটা বাজনা কানে আসছে। এটা মনে হচ্ছে শব্দের হ্যালুসিনেশন। এখানে নিশ্চয়উ কেউ ব্যাঞ্জো বাজাচ্ছে না। মস্তিষ্কের অক্সিজেনের অভাব হচ্ছে। সে হ্যালুসিনেশন দেখাতে শুরু করেছে। না হলে এই অবস্থায় ব্যাঞ্জোর বাজনা কানে আসত না। আমি হাত-পা নাড়ছি না। শরীর দোলাচ্ছি না। পরিশ্রম করা মানেই বাড়তি অক্সিজেন খরচ করা। এ-কাজ এখন করাই যাবে না। আমাদের ফুসফুসভরতি এখন কার্বন ডাইঅক্সাইড। এমন কোনো সিস্টেম যদি বের করা যেত যাতে কার্বন ডাইঅক্সাইড ভেঙে জীবনদায়িনী অক্সিজেন পেতাম।

$CO_2 \rightarrow C + O_2$

কোনো-একটা বিশেষ ক্যাটালিস্ট কার্বন ডাইঅক্সাইডকে ভেঙে দেবে।

জগলু ভাইয়ের গলা শোনা গেল, এই একে পানি থেকে তুলে দ্যাখ, এখনো আছে না গেছে।

আমাকে পানি থেকে তোলা হলো। বিরাট বড় হাঁ করে একগাদা অক্সিজেন আমি মুখে নিলাম না। সামান্য একটু নিলাম। হঠাৎ করে একগাদা অক্সিজেন নিলে আমাকে ধপাস করে মেঝেতে পড়ে যেতে হবে।

আমি তাকিয়ে আছি হাসিহাসি মুখে। এই অংশটা অভিনয়। দুই মিনিট অক্সিজেন ছাড়া যে থাকে তার মুখ হাসিহাসি হওয়া কঠিন ব্যাপার। সবাই তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তাদের চোখে বিস্ময় আছে, খানিকটা ভয়ও আছে। ভয়টা কীজন্যে আছে বুঝতে পারছি না।

আমি বললাম, আপনার সিদ্ধান্ত কী নিলেন তাড়াতাড়ি জানান। আমার

হাতে এত সময় নাই। আমাকে পানিতে ডুবিয়ে মারতে চাইলে মারবেন। কোনো অসুবিধা নাই।

জগলু ভাই বললেন, কোনো অসুবিধা নাই?

না, অসুবিধা নাই। আমরা সবাই মরব। আমি পানিতে ডুবে মরব, জগলু ভাই অন্যভাবে মরবে। তাকে কেউ হয়তো জ্বলন্ত ইটের ভাটায় ছেড়ে দিবে। ঠাণ্ডা মৃত্যু, গরম মৃত্যু। জিনিস একই। জগলু ভাই, আমাকে একটা সিগারেট দিতে বলেন না! লিকার চা আর একটা বেনসন সিগারেট।

জগলু ভাই বললেন, চা-সিগারেট খাবে?

আমি বললাম, কফি খেতে পারলে ভাল হত। কফির ব্যবস্থাতো নিশ্চয়ই নেই।

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। সবার চোখেই বিস্ময়। শুধু লাল চুলের পিশাচ টাইপ মানুষটার চোখ বিস্ময়মুক্ত। আমি আবার বললাম, চা-সিগারেটেই কি হবে?

জগলু ভাই মতিকে চা-সিগারেট দিতে বললেন। সিদ্ধান্ত হলো মনসুর সাহেবকে নিয়েই আমি যাব। আমার দায়িত্ব টাকার সুটকেস জগলু ভাইয়ের হাতে ফেরত দেওয়া।

জগলু ভাই আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে কঠিন গলায় বললেন, আমি আঙুল-কাটা জগলু, আমার সঙ্গে কোনো উনিশ-বিশ করলে আমি কিন্তু তোমাকে ছাড়ব না।

আমি বললাম, আমি হইলদা হিমু! আমার সঙ্গে কোনো উনিশ-বিশ করলে আমিও কিন্তু আপনাকে ছাড়ব না।

জগলু ভাই শীতল গলায় বললেন, তার মানে?

আমি মধুর ভঙ্গিতে হাসলাম। জগলু ভাই সেই হাসি কীভাবে নিলেন বুঝতে পারছি না। খুব ভালোভাবে নেবার কথা না।

যে-মেঘ এতক্ষণ শহরের ওপর ঝুলে ছিল, শহরের মানুষদের ভেজাবে কি ভেজাবে না—এ- বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না, সেই মেঘ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। ঝুম বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ইংরেজিতে এই বৃষ্টিকেই বোধহয় বলে—Cats and dogs. রিকশার হুড তুলে দেওয়া হয়েছে। পায়ের ওপর

ব্রাউন কালারের প্লাস্টিক। কোনোই লাভ হচ্ছে না। আমি এবং মনসুর সাহেব ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছি। ভদ্রলোকের গায়ের কাঁপুনি টের পাচ্ছি। শীতে কাঁপছেন বলেই মনে হচ্ছে। কিংবা তাঁর জ্বর এসে গেছে। জ্বর চলে আসা বিচিত্র না। তিনি এখনো ঘোরের মধ্যে আছেন। তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং আমি রিকশা করে তাঁর বাড়ির দিকে রওনা হয়েছি, এই সত্যটা মনে হয় এখনো গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছেন না। সারাক্ষণ এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। একটু পরপরই রিকশার পেছনের পরদা উঠিয়ে পেছনটা দেখতে চেষ্টা করছেন।

আমার হাতে একটা মোবাইল টেলিফোন। জগলু ভাই দিয়ে দিয়েছেন যাতে সারাক্ষণ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারি। নতুন একটা সিমকার্ড মোবাইলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজ শেষ হলে এই সিমকার্ড ফেলে আরেকটা ঢোকানো হবে। কোন নাম্বার থেকে টেলিফোন করা হয়েছে কেউ ধরতে পারবে না।

মনসুর সাহেব গলা নামিয়ে বললেন, রিকশাওয়ালা কি ওদের লোক?

আমি বললাম, না।

কীভাবে বুঝলে যে ওদের লোক না?

রিকশা ওরা এনে দেয়নি। আমি ঠিক করেছি।

ওরা কি আমাদের ফলো করছে?

না।

কীভাবে বুঝলে ওরা আমাদের ফলো করছে না?

জগলু ভাই পুরো ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। এই ধরনের মানুষ সবকিছু নিয়ে জুয়া ধরতে পছন্দ করেন। আমার ব্যাপারটাও তাঁর কাছে একটা জুয়ার মতো। জিতলে জিতবেন, হারলে হারবেন—এরকম ভাব।

হিমু!

জি?

তুমি সাধারণ মানুষের পর্যায়ের না।

আমরা কেউই সাধারণের পর্যায়ে না। সবাই সাধারণের ওপরে।

তুমি বিবাহ করেছ?

না।

চাকরি করো?

না।

মাসে দশ হাজার টাকা বেতনের একটা চাকরির ব্যবস্থা আমি তোমার জন্য করব?

আমি কাজকর্ম তো কিছু জানি না।

কাজকর্ম কিছুই জানতে হবে না। মাসের এক তারিখে তুমি হেড অফিসে চলে যাবে। সেখানে ক্যাশিয়ার ইয়াকুবউল্লাহর সঙ্গে দেখা করবে। সে নগদ দশ হাজার টাকা দেবে। ঠিক আছে?

অবশ্যই ঠিক আছে।

তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ। মাসে দশ হাজার সেখানে কোনো ব্যাপারই না। আজীবন এই এলাউন্স পাবে।

ধরুন কোনো কারণে এক তারিখ উপস্থিত হতে পারলাম না। তিন বা চার তারিখে উপস্থিত হলাম, তখন কি টাকাটা পাওয়া যাবে?

তুমি আমার কথাটা গুরুত্বের সঙ্গে নাও নাই বলে রসিকতা করার চেষ্টা করছ। রসিকতা করবে না। মাসের এক তারিখে ঠিকই তুমি টাকা পাবে। নাকি তুমি টাকা নেবে না?

কেন নেব না? আমি তো মহাপুরুষ না। মহাপুরুষদের টাকার দরকার থাকে না। আমি হামপুরুষ। আমার টাকার দরকার আছে।

হামপুরুষটা কী?

হাম হচ্ছে মহার উলটা।

তোমার সঙ্গে সিরিয়াস ধরনের কোনো কথাবার্তা বলা একেবারেই অর্থহীন। তার পরেও কিছু জরুরি কথা বলছি শোনো। মন দিয়ে শোনো।

একটু উঁচু গলায় কথা বলতে হবে। বৃষ্টি পড়ছে তো। আপনার ফিসফিসানি কথা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে না।

মনসুর সাহেব তার পরেও গলা উঁচু করলেন না। কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, তোমাকে আমি প্রটেকশন দেব। বুঝলে ব্যাপারটা? বাড়িতে পৌঁছার পরপর পুলিশ আমার বাড়ি ঘিরে রাখবে। জগলুর ওই আস্তানা রেইড করার ব্যবস্থা করব। কত ধানে কত চাল সে তখন বুঝবে।

আমি বললাম, তার মানে কি এই যে সুটকেসভরতি টাকার ব্যাগ নিয়ে আমি ফেরত যাব না?

অসম্ভব। সুটকেসের একটা টাকাও ঘর থেকে বের হবে না।

আমি যে কথা দিয়ে এসেছি। তারা অপেক্ষা করবে।

তুমি কাকে কথা দিয়েছ? ক্রিমিনালকে কথা দিয়েছ? ক্রিমিনালকে দেয়া কথা তোমাকে রক্ষা করতে হবে? গর্তে পড়ে রিকশা বড় ধরনের একটা হোঁচট খেয়ে থেমে গেল। আর তখনই আমার মোবাইল বেজে উঠল। জগলু ভাই টেলিফোন করেছেন।

কে, হিমু?

ইয়েস জগলু ভাই।

অবস্থা কী?

অবস্থা ঠিক আছে, আমরা এখনো গুলশান এলাকায় ঢুকি নাই। আরো দশ-পনেরো মিনিট লাগবে।

বুড়া আছে ঠিকমতো?

জি, উনি ঠিকমতোই আছেন।

কিছু বলছে?

আমার সঙ্গে পরামর্শ করার চেষ্টা করছেন।

কী পরামর্শ ?

উনি বলছেন বাড়িতে একবার ঢোকার পর ডিল অফ। তখন পুলিশ চলে আসবে। আপনার আস্তানায়ও পুলিশ চলে যাবে। পুলিশ রেইডের ব্যবস্থা করা হবে।

বুড়া এই কথা বলছে?

জি, জগলু ভাই। তবে আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না, আমি টাকা নিয়েই ফিরব।

আমারও সেইরকমই ধারণা।

আমি মনসুর সাহেবের দিকে তাকালাম। তিনি পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন। তাঁর হাত-পা শক্ত। গায়ের কাঁপুনি এখন আর নেই। আমি বললাম, স্যার, আপনি কি মেয়ের সঙ্গে কথা বলবেন?

না।

বাড়িতে ফিরছেন। আগেভাগে জানলে উনি খুশি হতেন।

মনসুর সাহেব জবাব দিলেন না। একবার বিদ্যুৎ চমকাল। বিদ্যুতের আলোয় দেখলাম তাঁর চোখ-মুখ শক্ত। দাঁত দিয়ে তিনি নিজের ঠোঁট

কামড়ে ধরে আছেন। সমুদ্রবিদ্যার বইয়ে আছে, যে-লোক দাঁত দিয়ে ঘনঘন ঠোঁট কামড়ায় সে বরাহ প্রজাতির মানুষ। সুযোগ পাইলেই সে অন্যের অনিষ্ট করিবার চেষ্টায় থাকে।

আমার তেমন কোনো অনিষ্ট হলো না। টাকাভরতি সুটকেস নিয়ে আমি সহজভাবেই গেট থেকে বের হয়ে এলাম। মনসুর সাহেবের মেয়েটাকে দেখলাম সুচিত্রা-উত্তমের যুগের নায়িকাদের মতো বিরহী-বিরহী চেহারা। গলার স্বর অসম্ভব মিষ্টি। দুই মিনিট তার কথা শুনলে যে-কোনো পুরুষের উচিত ধপাস করে তার প্রেমে পড়ে যাওয়া। তার গলার অস্বাভাবিক মিষ্টির ব্যাপারটা মনে হয় মেয়েটা জানে। কারণ, সে বড়ই স্বল্পভাষী।

আমি বললাম, মিস, টাকা গোনা আছে? না আমি আরেকবার গুনব ? যদি কম থাকে তা হলে দেখা যাবে জগলু ভাই আমার আঙুল অফ করে দিলেন। দশ আঙুল নিয়ে গেলাম, নয় আঙুল নিয়ে ফিরলাম।

টাকা হিসাবমতো আছে।

মিস, আপনার শরীর ভালো তো? দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে জ্বর। চোখও সামান্য লাল হয়ে আছে।

আপনার সঙ্গে স্বাস্থ্যবিষয়ক কথা আমি বলতে চাচ্ছি না।

একটা শুকনা টাওয়েল কি দিতে পারেন? মাথা ভিজে গেছে। চুল শুকাব। পরে একদিন এসে ফেরত দিয়ে যাব।

আপনি যেভাবে এসেছেন সেইভাবে ফেরত যাবেন। এবং এক্ষুনি বিদায় হবেন।

এক কাপ কফি খেয়ে কি যেতে পারি?

না। প্লিজ, লিভ দিস হাউজ।

আপনি কিন্তু বলেছিলেন গরম কফি খাওয়াবেন, স্ন্যাকস খাওয়াবেন।

দয়া করে বিদায় হোন।

রিকশায় উঠেই জগলু ভাইকে টেলিফোন করলাম, ওস্তাদ মাল ডেলিভারি পেয়ে গেছি, এক ঘণ্টার মধ্যে চলে আসব।

জগলু ভাই বললেন, আপাতত তোমার কাছে রাখো, পরে ব্যবস্থা করব।

আমার কাছে কোথায় রাখব? আমার নিজেরই থাকার জায়গা নাই।

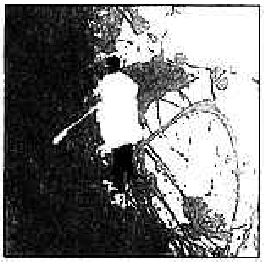
একটা ব্যবস্থা করো। এই মুহূর্তে আমাকে এটা নিয়ে যন্ত্রণা করবে না। বিরাট ঝামেলায় পড়ে গেছি।

জগলু ভাই কট করে টেলিফোন লাইন কেটে দিলেন। তিনি যে বিশেষ ধরনের বড় কোনো ঝামেলায় পড়েছেন তা তাঁর গলার স্বরেই বোঝা যাচ্ছে। গলা শেষের দিকে কেঁপে যাচ্ছে।

রিকশাওয়ালা বৃষ্টিতে রিকশা টানছে। সে বেছে বেছে বড় বড় খানাখন্দে রিকশা টেনে নিয়ে প্রায় হুমড়ি খাওয়ার মতো করে পড়ছে। কাজটা করে সে আনন্দ পাচ্ছে বলেও মনে হচ্ছে। একেকবার পড়ছে আর দাঁত বের করে বলছে, এইটা দেখি পুশকুনি!

আমি আপাতত বাদলের বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। আজ রাতটা বাদলের সঙ্গে থাকাই ভালো।

কলিংবেলের প্রথম শব্দেই দরজা খুলে গেল। খোলা দরজায় স্লিপিং গাউন পরা খালুসাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর ঠোঁটে পাইপ।



দুই.

স্লিপিং গাউন এবং পাইপ এই দুটি বস্তু বাংলাদেশ থেকে উঠে গেছে বলে আমার ধারণা। এই দুই বস্তু এখন শুধু সিনেমায় দেখা যায়।

নায়িকার বড়লোক বাবারা স্লিপিং গাউন পরে ঠোঁটে পাইপ নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে ড্রাইভার জাতীয় কারো সঙ্গে কথা বলেন (যে তার মেয়ের প্রেমে পড়েছে)— তুমি কি জানো আমার বংশগৌরব? তুমি বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চাও, এত তোমার স্পর্ধা? তুমি আমার খানদান ধুলায় লুটিয়ে দিতে চাও...ইত্যাদি ইত্যাদি।

খালুসাহেব খানদানি বংশের একজনের মতোই আমার সঙ্গে কথা বলা শুরু করলেন, কী চাও?

আমি বিনীতভাবে বললাম, কিছু চাই না খালুসাহেব।

কিছু চাও না, এদিকে বিছানা-বালিশ নিয়ে উপস্থিত হয়েছ?

বিছানা-বালিশ না খালুসাহেব। শুধু একটা স্যুটকেস।

সুটকেসটা নিয়েই-বা এসেছ কেন? আমি তো তোমাকে বলেছি, এ-বাড়ি তোমার জন্যে আউট অব বাউন্ড এরিয়া। বলেছি না?

জি, বলেছেন।

তুমি আমার ছেলের মাথা সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়েছ, এটা জানো?

আমি জবাব দিলাম না। খালুসাহেবের রাগ বাড়ছে। কারোর রাগ যখন চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকে, তখন চুপ করে থাকলে চক্রবৃদ্ধিটা কেটে যায়।

তুমি যেভাবে সুটকেস বগলে নিয়ে ঢুকেছ ঠিক সেইভাবে সুটকেস বগলে নিয়ে চলে যাবে। ডাইনে-বামে তাকাবে না।

রিকশা ছেড়ে দিয়েছি যে খালুসাহেব। বাইরে বৃষ্টি, এখন যাই কীভাবে!

রোদ-বৃষ্টি তোমার জন্যে কোনো ব্যাপার না। তুমি ভিজতে ভিজতে চলে যাবে, এবং এখনই তা করবে। দিস ইজ অ্যান অর্ডার।

বাদলের কাছে সুটকেসটা রেখে চলে যাই। সুটকেসে দামি কিছু জিনিস আছে।

তোমার সুটকেসে যদি কোহিনুর হীরাও থাকে আই ডোন্ট কেয়ার, গো গো।

আমি খালুসাহেবের দিকে তাকিয়ে মধুর ভঙ্গিতে বললাম ঠিক আছে খালুসাহেব, আমি চলে যাচ্ছি, যাবার আগে আপনার সম্পর্কে একটা প্রশংসাসূচক কথা বলে যেতে চাই যদি অনুমতি দেন।

খালুসাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, প্রশংসাসূচক কী কথা?

আপনি আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন, রাগারাগিও করলেন। কিন্তু সবই করলেন পাইপ মুখে রেখে। একবারও ঠোঁট থেকে পাইপ পড়ে গেল না। এটা কীভাবে করলেন? ভালো প্র্যাকটিস ছাড়া এটা সম্ভব না।

খালুসাহেব মুখ থেকে পাইপ হাতে নিলেন। গলার স্বর এক ধাপ নামালেন। সেইসঙ্গে চোখের দৃষ্টি কিছুটা শাণিয়ে নিয়ে বললেন, হিমু, তোমার স্বভাব আমি জানি। তুমি জটিল কথাবার্তার সময় উদ্ভট কিছু কথা বলে বক্তার কনসেন্ট্রেশন নষ্ট করে দাও। তাকে কনফিউজ করো। আমাকে নিয়ে এই খেলাটা খেলবে না।

জি আচ্ছা।

একজন বাবা যখন দেখে তার অতি বুদ্ধিমান একটি ছেলে কারো পাল্লায় পড়ে ভেজিটেবল হয়ে গেছে তখন সেই বাবার কেমন লাগে তুমি বুঝবে না। তুমি কি জানো এখন বাদলকে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখছে?

জানি না তো!

প্রফেসর সামসুল আলম, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সাইকিয়াট্রি বিভাগের প্রধান, বাদলকে এখন দেখছেন। বাদলের কিছুটা উন্নতিও হয়েছে। এই অবস্থায় আমি চাই না বাদল আবার তোমার পাল্লায় পড়ুক।

বাদলের কিছু উন্নতি হয়েছে?

অবশ্যই হয়েছে।

উনি কি বাদলের মাথা থেকে গানটা বের করতে পেরেছেন?

খালু সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, বাদলের মাথা থেকে গান বের করা মানে কী? তার মাথায় কী গান?

জটিল একটা গান তার মাথায় অনেক দিন থেকে ঘুরপাক খাচ্ছে। ক্রমাগত বেজেই যাচ্ছে। আমার ধারণা, মূল কালপ্রিট ওই গান। প্রফেসর সাহেব যদি কোনোমতে বড়শি দিয়ে ওই গান বের করে নিয়ে আসতে পারেন তা হলেই কেল্লা ফতে। বাদল ভেজিটেবল অবস্থা থেকে বের হয়ে যেত।

খালুসাহেব হতভম্ব গলায় বললেন, গানের কথা তো কিছুই জানি না। আমি বললাম, বৃষ্টিটা এখন মনে হয় একটু কম। খালুসাহেব, আমি তা হলে যাই। রাস্তার মোড় থেকে একটা রিকশা নিয়ে নেব।

দাঁড়াও দাঁড়াও, গানের ব্যাপারটা আগে ফয়সালা করি, তারপর যাবে।

গানের ব্যাপারটা তো খালুসাহেব চট করে ফয়সালা করা যাবে না। দেরি হবে। তখন রিকশা পাওয়া যাবে না। ঝড়বৃষ্টির রাতে এমনিতেই রিকশা থাকে না।

দেরি হলে থেকে যাবে। এসো আমার ঘরে।

আমি একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস লক্ষ করলাম, খালুসাহেব পাইপ মুখ থেকে খুলে হাতে নেওয়ার পর থেকে মোটামুটি স্বাভাবিক গলায় কথা বলছেন। কথা বলার ভঙ্গির সঙ্গে পোশাকের সম্পর্ক নিয়ে কোনো গবেষণা হয়েছে কি না কে জানে। ছোটখাটো একটা গবেষণা হতে পারে। যে চশমা পরে সে চোখে চশমা থাকা অবস্থায় কীভাবে কথা বলে এবং না-থাকা অবস্থায় কীভাবে কথা বলে টাইপ গবেষণা।

খালুসাহেব।

বলো।

আমি চট করে সুটকেসটা বাদলের ঘরে রেখে আসি। এক মিনিট লাগবে।

যাও, রেখে আসো। ওর সঙ্গে কথা বলবে না।

অবশ্যই কথা বলব না।

বাদল পদ্মাসনের ভঙ্গিতে খাটে বসে আছে। বিশেষ কোনো যোগাসন নিশ্চয়ই। 'হোম' শব্দ করে নিশ্বাস নিচ্ছে এবং 'সুন' শব্দ করে ফেলছে। যোগাসনের ব্যাপারগুলো নিঃশব্দে হয় বলে জানতাম। এই প্রথম 'হুম-সুন'

সিস্টেম দেখলাম। বাদল চোখ মেলে আমাকে দেখেই চোখ বন্ধ করে ফেলল। তার মুখভরতি হাসি। যে যোগসাধনা করছে, তাকে বিরক্ত করা ঠিক না। এবং এমন কিছু করাও ঠিক না যাতে যোগীর সাধনায় বিঘ্ন হয়। তার পরেও আমি বললাম, তোর খাটের নিচে একটা সুটকেস রাখলাম।

বাদল বলল, রাখো। তুমি যে আসবে এটা আমি জানতাম।

কীভাবে?

তুমি নিজের ইচ্ছায় আসনি। আমি তোমাকে টেলিপ্যাথিক মেসেজ পাঠিয়েছি। তুমি সেই মেসেজ পেয়েই চলে এসেছ। আমার কথা কি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে?

অবশ্যই হচ্ছে। তুই খামাখা আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলবি কেন?

আমার ধারণা, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি আমার টেবিলের কাছে যাও, দ্যাখো টেবিলে একটা লেখা আছে। কী লেখা সেটা পড়ো। লেখাটা টেবিলঘড়ি দিয়ে চাপা দেয়া।

তুই ধ্যানের মধ্যে ভ্যাড়ভ্যাড় করে কথা বলেই যাচ্ছিস। এতে ধ্যান হবে?

তোমাকে দেখলে আমার মাথার ঠিক থাকে না। হিমু ভাইজান, রাতে থাকবে তো?

হুঁ।

বিছানার কোন পাশে শোবে? ডান পাশে না বাঁ পাশে? নাকি একা ঘুমাতে চাও? তুমি যদি একা ঘুমাতে চাও তা হলে আমি সোফায় শুয়ে থাকব।

এত কথা বলিস না তো, হুম-সুন করতে থাক। আমি খালুজানের সঙ্গে দেখা করে আসি।

টেবিলের ওপর আমার লেখাটা পড়ে তারপর যাও।

বাদল পেনসিল দিয়ে লিখেছে, সন্ধ্যা ছ'টা একুশ মিনিট। আমি পদ্মাসনে বসে হিমু ভাইজানকে টেলিপ্যাথিক মেসেজ পাঠিয়ে বলেছি তিনি যেন চলে আসেন। মেসেজ তাঁর কাছে পৌঁছেছে কি না বুঝতে পারছি না।

রাত আটটা দশ। আমি আবারও মেসেজ পাঠিয়েছি। এই মেসেজ ডেলিভারি হয়েছে।

আমি কাগজটা আগের জায়গায় রাখতে রাখতে বললাম, মেসেজ যে ডেলিভারি হয়েছে এটা বুঝলি কীভাবে?

সিগন্যাল পেয়েছি।

কীরকম সিগন্যাল?

মাথার ভেতর পিঁ করে শব্দ হলো।

মোবাইল টেলিফোনে মেসেজ পাঠালে যেরকম শব্দ হয় সেরকম?

হুঁ।

ভালো কথা, গানটার অবস্থা কী?

কোন গানটা?

তোর মাথায় যেটা বাজে, 'নে দি লদ' না কী যেন?

ও আচ্ছা, ওই গান? সেটা তো আছেই। শুধু যখন ধ্যানে বসি তখন থাকে না।

এখন নেই?

না।

ধ্যান করতে থাক আমি আসছি।

খালুসাহেব খাটের পাশে ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছেন। এখন তাঁর ঠোঁটে পাইপ। হাতে গ্লাস। গ্লাসে যে-পদার্থ তা দেখতে পানির মতো হলেও পানি যে না তা বোঝা যাচ্ছে। খালুসাহেব অতি সাবধানে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন। প্রতিবার চুমুক দেবার সময় তাঁর চেহারায় খানিকটা চোর ভাব চলে আসছে। মেজো খালা বাড়িতে নেই মনে হচ্ছে, এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে খালুসাহেব বোতল নামিয়ে ফেলেছেন। গ্লাসের বস্তু যত কমতে থাকবে খালুসাহেবের মেজাজের ততই পরিবর্তন হবে। কোনদিকে হবে সেটা বলা যাচ্ছে না। পরিবর্তন শুভ দিকেও হতে পারে, আবার অশুভ দিকেও হতে পারে।

হিমু!

জি খালুসাহেব?

খাটের ওপর আরাম করে বসে বাদলের গানের ব্যাপারটা বলো। পা তুলে আরাম করে বসো।

আমি খাটে পা তুলে বসলাম। মনে হচ্ছে খালুসাহেবের আজকের পরিবর্তনটা শুভর দিকে যাবে। গলার স্বর এখনই কেমন যেন মিহি। সময়ের সঙ্গে আরো মিহি হবে। আবেগে চোখে পানিও এসে যেতে পারে। তরল বস্তুর অনেক ক্ষমতা।

আমি বললাম, খালুসাহেব, গ্লাসে করে কী খাচ্ছেন?

গ্লাসে কী খাচ্ছি সেটা তোমার বিবেচ্য না। বাদলের প্রসঙ্গে বলো। ওর মাথায় কী গান?

বিশেষ একটা গান ক্রমাগত তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

ঘুরপাক খাচ্ছে মানে কী?

মানে হচ্ছে গানটা তার মাথায় বাজছে।

মাথায় গান বাজবে কীভাবে? মাথা কি গ্রামোফোন নাকি?

ব্যাপারটা অনেকটা সেরকম।

বুঝিয়ে বলো। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

মনে করুন আপনি কোথাও যাচ্ছেন। হঠাৎ কোনো-একটা নাপিতের দোকান থেকে হিন্দি গান ভেসে এল, 'সাঁইয়া দিল মে আনা রে...' গানটা মাথায় খুট করে ঢুকে গেল। আপনি অফিসে চলে গেলেন— গান কিন্তু বন্দ হলো না, বাজতেই থাকল। অফিস থেকে বিকেলে বাসায় ফিরেছেন। রাতে খাওয়াদাওয়া করে ঘুমুতে গেছেন, তখনো মাথায় গান বাজছে— 'সাঁইয়া দিল মে আনা রে, আকে ফির না যানা রে...'। বাদলের এই ব্যাপারটাই ঘটেছে।

'সাঁইয়া দিল মে আনা রে' মানে কী?

মানে হচ্ছে, বন্ধু আমার হৃদয়ে এসো।

বাদলের মাথায় এই গান ঘুরছে?

এই গান না, তার মাথায় অন্য গান।

কী গান?

'নে দি লদ বা রওয়াহালা গপা।'

এটা কী ভাষা?

জানি না খালুসাহেব।

অর্থ কী?

অর্থও জানি না। অন্য কোনো গ্রহের ভাষা হতে পারে—এলিয়েনদের ভাষা।

বাদলের মাথায় এলিয়েনদের সঙ্গীত বাজছে?

সম্ভাবনা আছে। ভিন গ্রহের অতি উন্নত প্রাণীদের মহান সংগীত হতে পারে।

হিমু, তোমার কি মনে হয় না বাদলের মাথাটা পুরোপুরি গেছে? সে এখন বদ্ধউন্মাদ?

খালুসাহেব! আপনি-আমি মনে করলে তো হবে না। সামসুল আলম সাহেব যদি মনে করেন তা হলেই শুধু তাকে বদ্ধউন্মাদ বলা যাবে। বদ্ধউন্মাদের সার্টিফিকেট উনি দেবেন। আমরা দেব না।

সামসুল আলমটা কে?

যিনি বাদলের চিকিৎসা করছেন।

তার নাম তুমি জানো কীভাবে?

আপনিই তো বলেছেন।

ও আচ্ছা, আমি বলেছি? নিজেই ভুলে গেছি।

খালুসাহেব ইজিচেয়ার থেকে উঠলেন। বইয়ের র‍্যাকের কাছে গেলেন। 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র সেটের পেছন থেকে চ্যাপটা টাইপ একটা বোতল বের করে নিয়ে এলেন।

হিমু!

জি খালুসাহেব?

গানটা বাদলের মাথা থেকে দূর করার উপায় কী?

উপায় নিয়ে সামসুল আলম সাহেবকে ভাবতে হবে। তাঁরা এই লাইনের বিশেষজ্ঞ।

তুমি তাঁর সঙ্গে কথা বলবে? উনাকে এলিয়েনদের গানের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবে?

আপনি চাইলে বলতে পারি।

থাক, দরকার নেই। আমিই বলব। গানটা কী যেন, সাঁইয়া দিল মে আনা রে...

না, এই গান না, অন্য গান। দুর্বোধ্য গান— লে দি লদ...

এলিয়েন সঙ্গীত, তা-ই না?

পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছি না তবে হতে পারে।

খালুসাহেব চ্যাপটা বোতলের জিনিস গ্লাসভরতি করে নিলেন।

তাঁকে খুবই চিন্তিত লাগছে। মাতালরা চিন্তা করতে ভালোবাসে। খালুসাহেব এখন তাঁর ছেলেকে নিয়ে চিন্তা করে আরাম পাচ্ছেন।

হিমু!

জি খালুসাহেব?

রাত কত হয়েছে দ্যাখো তো!

প্রায় বারোটা।

তোমার কি ধারণা রাত বেশি?

সাধারণ মানুষের জন্যে অনেক রাত। তবে সাধু-সন্ন্যাসী কিংবা জগলু ভাইয়ের জন্যে রাতের মাত্র শুরু।

জগলু ভাইটা কে?

আমার পরিচিত একজন। নিশি মানব।

নিশি-মানব মানে?

যারা নিশিতে ঘুরে বেড়ান।

হঠাৎ করে নিশি মানবের কথা এল কিভাবে?

আলোচনাটা আপনার কথার সূত্র ধরেই এসেছে। শুরুটা হয় আপনি যখন জানতে চান রাত বেশি কি-না।

ও আচ্ছা, তোমার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম যে এত রাতে সামসুল আলম সাহেবকে টেলিফোন করা ঠিক হবে কি না।

পাগলের ডাক্তারদের মধ্যরাতে টেলিফোন করাই ভালো।

তাঁর নাম্বারটা বলো।

নাম্বার তো খালুসাহেব আমি জানি না।

ভালো সমস্যা হলো তো! এখন কী করা যায়? আমি তো তাঁর নাম্বার জানি না।

আপনি চিন্তা করে কোনো সমাধান বের করতে পারেন কি না দেখুন। জটিল সমস্যাগুলোর সমাধান সাধারণত খুব সহজ হয়। আমি এই ফাঁকে কিছু খেয়ে আসি।

তুমি রাতে কিছু খাওনি?

জি না।

যাও খেয়ে আসো।

খেয়ে আপনার এখানে আসব, না বাদলের সঙ্গে শুয়ে পড়ব?

খালুসাহেব জবাব দিলেন না। গভীর দুশ্চিন্তা নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর বর্তমান দুশ্চিন্তা বাদলকে নিয়ে না। টেলিফোন নাম্বার নিয়ে। মাতালরা অতিদ্রুত এক দুশ্চিন্তা থেকে আরেক দুশ্চিন্তায় যেতে পারে।

খেতে বসেছি। মেজো খালার বাড়িতে খাবার আয়োজন এমনিতেই ভালো থাকে, আজ আরো ভালো। বিশাল সাইজের পাবদা মাছ। ঝোল ঝোল করে রান্না করা হয়েছে। রান্নাও হয়েছে চমৎকার। ভুনা গোরুর মাংস আছে। ইলিশ মাছের ডিমের একটা ঝোলও আছে। এই প্রিপারেশনটা দ্রৌপদীও জানতেন বলে মনে হয় না। খাবার মাঝখানে মোবাইল টেলিফোন বাজল। জগলু ভাইয়ের টেলিফোন। আমি টেলিফোন কানে নিয়ে বললাম, হ্যালো, জগলু ভাই।

জগলু ভাই ধমকের গলায় বললেন, তুমি কোথায়?

আমি বললাম, বাদলদের বাড়িতে।

সেটা কোথায়? অ্যাড্রেস কী?

কলাবাগানে। নাম্বার-টাম্বার তো বলতে পারব না। বাসা চিনি। অ্যাড্রেস জানি না।

আমার জিনিস কোথায়?

সঙ্গেই আছে। বাদলের খাটের নিচে রেখে দিয়েছি।

বাদল কে?

আমার খালাতো ভাই।

তুমি যেখানে আছ সেই অ্যাড্রেস জেনে নিয়ে আমাকে জানাও, আমি এসে জিনিস নিয়ে যাব।

নিজে আসবেন, না কাউকে পাঠাবেন?

একজনকে পাঠাব।

তার পাসওয়ার্ড কী?

তার মানে?

সাংকেতিক কোনো শব্দ। সে সেই শব্দ বললে আমি বুঝব যে সে আপনার নিজের লোক, তখন তার কাছে জিনিস ডেলিভারি দিয়ে দেব। যেমন পাবদা মাছ একটা পাসওয়ার্ড হতে পারে। সে গেটের কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, পাবদা মাছ। ওমনি তাকে সুটকেস দিয়ে দিলাম।

তুমি কথা বেশি বলো। শোনো আমি মতিকে পাঠাচ্ছি। পাবদা মাছ, শিং মাছ কিছু না। মতিকে তুমি চেনো। চেনো না?

অবশ্যই চিনি। জগলু ভাই একটা সমস্যা আছে যে!

কী সমস্যা?

মতি ভাই আমার কাছ থেকে সুটকেস নিয়ে গেল, তারপর আপনাকে বলল, সুটকেস পেয়েছি ঠিকই কিন্তু সুটকেসে জিনিস ছিল না। জিনিস সে নিজে গাপ করে দিল। এটা হতে পারে না?

মতি আমার অতি বিশ্বাসী মানুষ।

অবিশ্বাসের কাজগুলো খুব বিশ্বাসীরাই করে।

ঠিক আছে, রাতে কাউকে পাঠাব না। সম্ভব হলে নিজেই আসব। সম্ভব না হলে কাল দিনে অন্য ব্যবস্থা করব। রাতে মোবাইল সেট অন রাখবে।

জগলু ভাই, আরেকটা কথা ছিল।

কী কথা?

আপনি যদি পুলিশের হাতে অ্যারেস্ট হয়ে যান, তখন সুটকেসটা কী করব?

অ্যারেস্ট হব কেন?

কথার কথা বলছি। হতেও তো পারেন। আপনার ঘনিষ্ঠজনদের কেউ গোপনে পুলিশকে খবর দিল। আপনার অ্যান্টিপার্টির টাকা খেয়ে এই কাজটা তো করতে পারে। পারে না? সকালে খবরের কাগজ খুলে দেখলাম, প্রথম পাতায় আপনার ছবি। আপনার পেছনে রমনা থানার ওসি এবং সেকেন্ড অফিসার হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। সামনে একটা টেবিল। টেবিলে পিস্তল। পিস্তলের গুলি ফুলের মতো করে সাজানো। পুলিশরা পিস্তলের গুলি সব সময় ফুলের মত করে সাজায় কেন আপনি কি জানেন?

আমার সঙ্গে ফালতু কথা একেবারেই বলবে না।

জি আচ্ছা। জগলু ভাই, আপনার খাওয়াদাওয়া হয়েছে?

আমার খাওয়াদাওয়া নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তুমি তোমারটা নিয়ে চিন্তা করো।

আমি হেভি খাওয়াদাওয়া করছি। বিশাল সাইজের পাবদা মাছ। আপনার যদি এখনো খাওয়া না হয়ে থাকে, চলে আসতে পারেন। ইলিশ মাছের ডিম আছে, গোরু ভুনা আছে।

চুপ স্টুপিড!

জগলু ভাই টেলিফোন রেখে দিলেন। টেলিফোন নিয়ে আমার কিছু সমস্যা আছে। টেলিফোনের কথা মনে হয় কখনো শেষ হয় না। কিছু-না-

কিছু বাকি থাকে। একবার কারো সঙ্গে কথা বললে ইচ্ছা করে আরো কারো সঙ্গে কথা বলি। কঠিন গলার কারো সঙ্গে কথা বললে সঙ্গে সঙ্গেই মিষ্টি গলার কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে।

মিতুকে কি টেলিফোন করব? নিশ্চয়ই এই মেয়ে এখনো ঘুমিয়ে পড়েনি। বাবার সঙ্গে কথা বলছে। মনসুর সাহেব মেয়েকে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর গল্প শোনাচ্ছেন। নিরাপদ অবস্থায় ভয়ঙ্কর গল্প শুনতেও ভালো লাগে, বলতেও ভালো লাগে। মিতুকে টেলিফোন করা আমার কর্তব্যের মধ্যেও পড়ছে। তাদেরকে সাম্প্রতিক ঘটনাবলির বিষয়ে আপটুডেট রাখা দরকার। আমি টেলিফোনের বোতাম টিপলাম। ওপাশ থেকে মিতুর তীক্ষ্ণ গলা শোনা গেল, কে?

মিতু কেমন আছ?

কে?

গলা চিনতে পারছ না?

আপনি কে?

গলা চিনেও কে কে করছ কেন? তুমি অতি বুদ্ধিমতী মেয়ে। তোমার মোবাইল সেটে আমার নাম্বার উঠেছে। আমার গলার স্বরও তোমার পরিচিত। তার পরেও কে কে করেই যাচ্ছ।

আপনি চাচ্ছেন কী?

মনসুর সাহেব কি ঘুমিয়ে পড়েছেন?

বাবাকে আপনার দরকার কেন?

মিতু, তুমি প্রশ্নের জবাব প্রশ্ন দিয়ে দিচ্ছ কেন? বোকা মেয়েরা সবসময় প্রশ্নের জবাব প্রশ্ন দিয়ে দেয়। তুমি কি বোকা?

আপনি কী চাচ্ছেন পরিষ্কার করে বলুন।

আমি তো পরিষ্কার করেই বলছি। তোমার বাবার অবস্থা কী? ডাক্তাররা তাকে কি ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন? তিনি ঘুমুচ্ছেন। তোমার বাবা কি আমার প্রসঙ্গে কিছু বলেছেন?

আপনার প্রসঙ্গে কী বলবেন?

আবারও প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন? তোমার বাবা কি বলেননি যে তাঁকে ছাড়িয়ে আনার ব্যাপারে আমার সামান্য ভূমিকা ছিল?

আপনার কোনোই ভূমিকা ছিল না। আপনি টাকার বিনিময়ে কাজটা

করে এখন মহৎ সাজার চেষ্টা করছেন। টাকাটা কি জায়গামতো পৌঁছাতে পেরেছেন?

এইখানে ছোট্ট একটা সমস্যা হয়েছে। টাকা এখনো পৌঁছাতে পারিনি। আপাতত টাকাটা আমার খালাতো ভাইয়ের খাটের নিচে রাখা আছে। জগলু ভাই বলেছেন রাতে কিংবা সকালে এসে নিয়ে যাবেন। আমি তাঁর কথায় সেরকম ভরসা পাচ্ছি না। আমার ধারণা, বেশ কিছুদিন সুটকেসটা আমার কাছে রাখতে হবে। ভালো কথা, সুটকেসটা কিছুদিন কি তোমার কাছে রাখতে পারি?

তার মানে?

যত্ন করে কোথাও রেখে দিলে পরে কোনো একসময় জগলু ভাইকে দিয়ে দিলাম।

আমার সঙ্গে ফাজলামি করছেন?

ফাজলামি করব কেন? সুটকেসটা বাদলের খাটের নিচে রাখা নিরাপদ না। আমি যেখানে থাকি সে ঘরের দরজা লাগানোর ব্যবস্থাটা নাই।

দয়া করে আপনি আর কখনো আমাকে টেলিফোন করবেন না।

কেন?

আপনি একধরনের খেলা খেলার চেষ্টা করছেন। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি এ পার্ট টু ইট। আমাকে আর আমার বাবাকে এর মধ্যে জড়াবেন না।

জগলু ভাই যেভাবে নিজের কথার মাঝখানেই টেলিফোন কেটে দিয়েছিলেন এই মেয়েও তা-ই করল। তার নিজের কথা পুরোপুরি শেষ না করেই লাইন কেটে দিল।

বাদলের যোগব্যায়াম শেষ হয়েছে। সে সোফায় বসে আছে। তার মুখ শুকনা। চোখ বিষণ্ন। সাধারণ ব্যায়ামের পর মানুষজন শারীরিকভাবে ক্লান্ত হয়। যোগব্যায়ামের পর হয়তো মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়। মানুষের মানসিক ক্লান্তি ধরা পড়ে চোখে।

আমি বললাম, তোর হুম-সুন শেষ?

বাদল বলল, হুঁ।

ভ্যাবদা মেরে বসে আছিস কেন? সমস্যা কী?

গান বাজতে শুরু করেছে।

নে দি লদ গান?

হুঁ। কী যে যন্ত্রণা! তোমাকে যদি বোঝাতে পারতাম! ঘুমের মধ্যেও এই গান হয়। তোমাকে এইজন্যেই পাগলের মতো খুঁজছি।

আমি কী করব?

গানটা থেকে আমাকে উদ্ধার করো। গানটা মাথা থেকে বের করে দাও।

তোর জন্যে খালুসাহেব সাইকিয়াট্রিস্টের ব্যবস্থা করছেন। সাইকিয়াট্রিস্ট গান বের করে দেবেন। সাইকিয়াট্রিস্টদের হাতে নানান কায়দাকানুন আছে।

তাদের চেয়ে অনেক বেশি কায়দাকানুন তোমার হাতে আছে। তুমি ইচ্ছা করলেই আমাকে উদ্ধার করতে পার।

তোকে উদ্ধার করলে লাভ কী?

কোনো লাভ নেই?

না। তোকে এক জায়গা থেকে উদ্ধার করলে আরেক জায়গায় পড়বি।

তখন তুমি আবারও উদ্ধার করবে।

ধারাবাহিক পতন এবং ধারাবাহিক উত্থান?

হুঁ।

তোর গানটা কী আরেকবার বল তো—

'নে দি লদ বা রয়াওহালা গপা...'

শেষ শব্দ 'গপা'?

হ্যাঁ গপা।

শুধু গপা না হয়ে গপাগপ হলে ভালো হতো।

ভাইজান, প্লিজ, হেল্প মি। এই গানের জন্যে আরাম করে আমি ঘুমাতে পর্যন্ত পারি না।

তোর গানের অর্থ বের করে ফেললেই গানটা মাথা থেকে দূর হবে বলে আমার ধারণা। তবে দূর হলেও লাভ হবে না, আবার অন্য কোনো গান তোর মাথায় ঢুকে পড়বে।

যখন ঢুকবে তখন দেখা যাবে। আপাতত এটা দূর করো।

তোর মাথায় একটা গানের প্রথম লাইন উলটো করে বাজছে। লাইনটা হলো, 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে।' মিলিয়ে দ্যাখ।

বাদল বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। তারপর ঘোরলাগা গলায় বলল, আরে তা-ই তো! এটা তুমি কখন বের করলে? এখন?

না। যেদিন বলেছিস সেদিনই বের করেছি।

এতদিন বলনি কেন?

দরকার কী?

হিমু ভাইজান, তুমি অদ্ভুত একজন মানুষ। শুধু অদ্ভুত না, অতি অতি অদ্ভুত।

আমরা সবাই অতি অতি অদ্ভুত। তুই নিজেও অতি অতি অদ্ভুত, আবার জগলু ভাইজানও অতি অতি অদ্ভুত!

জগলু ভাইজান কে?

তুই চিনবি না। আছে একজন। নিশি মানব। মাথা থেকে গানটা গেছে?

হুঁ।

ঘুমিয়ে পড়।

আজ খুবই আরামের একটা ঘুম হবে ভাইজান।

বাদল সোফায় গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমন্ত বাদলকে দেখতে ভালো লাগছে। পৃথিবীর সব ঘুমন্ত মানুষ একরকম। একজন ঘুমন্ত মানুষের সঙ্গে আরেকজন ঘুমন্ত মানুষের কোনো প্রভেদ নেই। জাগ্রত মানুষই শুধু একজন আরেকজনের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায়।

মোবাইল টেলিফোনের রিং বাজছে। জগলু ভাই টেলিফোন করেছেন। তিনি ঘুমিয়ে থাকলে তাঁর সঙ্গে বাদলের কোনো প্রভেদ থাকত না। জেগে আছেন বলেই তিনি এখন আলাদা।

জগলু ভাই, স্লামালিকুম।

জিনিস কি ঠিকঠাক আছে?

জিনিসের চিন্তায় আপনার কি ঘুম হচ্ছে না?

যা জিজ্ঞেস করেছি তার জবাব দাও।

জিনিস ঠিকঠাক আছে, ওই যে সুটকেস দেখা যায়। ডালা খুলে দেখব?

দরকার নাই। কাল সকালে তোমার সামনে ডালা খুলব।

জগলু ভাই, আপনি এখন আছেন কোথায়?

তা দিয়ে তোমার দরকার কী?

ঝুম বৃষ্টি পড়ছে তো, এই সময় পুত্রের পাশে শুয়ে থাকার আলাদা আনন্দ। বজ্রপাতের সময় বাচ্চারা ভয় পায়। তখন হাত বাড়িয়ে বাবা-মাকে ছুঁয়ে দেখতে চায়। আপনার ছেলে নিশ্চয়ই অনেক দিন আপনাকে ছুঁয়ে দেখে না।

আমার ছেলে আছে তুমি জানো কীভাবে?

অনুমান করে বলছি জগলু ভাই। আমি কিছুই জানি না। আপনার যে-বয়স এই বয়স পর্যন্ত আপনি চিরকুমার থাকবেন, তা হয় না। বিয়ে করলে ছেলেমেয়ে হবার কথা। জগলু ভাই, আপনার কি একটাই ছেলে?

হ্যাঁ।

যদি একটাই ছেলে হয়, তা হলে অবশ্যই তার নাম বাবু।

এক ছেলে হলে তার নাম বাবু হবে কেন?

হবেই যে এমন কোনো কথা নেই, তবে বেশির ভাগ সময় হয়। অতিরিক্ত আদর করে সারাক্ষণ বাবা বাবা ডাকা হয়। সেই বাবা থেকে বাবু।

হিমু!

জি ভাইজান?

আমার সঙ্গে চালাকি করবে না। আমি জানে শেষ করে দেব।

জি আচ্ছা।

আমার ছেলের নাম বাবু তুমি কোত্থেকে জেনেছ?

অনুমান করেছি।

আবার চালাকি! আমার সঙ্গে চালাকি? আমার ছেলের নাম কি তোমাকে মতি বলেছে?

জি না।

তোমাকে যে মোবাইল টেলিফোন দেয়া হয়েছে সেখানে কি তার নাম এন্ট্রি করা আছে? থাকার কথা না, তার পরেও কি আছে?

জানি না জগলু ভাই।

দ্যাখো, এক্ষুনি চেক করে দ্যাখো।

কীভাবে চেক করতে হয় এটাও তো জানি না। আমি শুধু মোবাইল

অন-অফ করতে জানি। আমার খালাতো ভাই বাদল এইসব ব্যাপারে খুবই পারদর্শী, তবে সে এখন ঘুমুচ্ছে।

তাকে ডেকে তোলো।

সে খুবই আরাম করে ঘুমুচ্ছে, তাকে ডেকে তোলা যাবে না।

আমি ডেকে তুলতে বলছি, তুমি তোলো।

আচ্ছা জগলু ভাই শুনুন, মনে করুন আপনার ছেলে অসুস্থ। অনেক দিন সে আরাম করে ঘুমায় না। একবার দেখা গেল অসুখ কমেছে। সে আরাম করে ঘুমুচ্ছে। তখন কি আপনি তাকে ঘুম থেকে তুলবেন?

আমার ছেলে যে অসুস্থ এটা তুমি জানো কীভাবে?

জগলু ভাই, আমি কথার কথা বলেছি।

অবশ্যই কথার কথা না। তুমি যা বলেছ জেনেশুনেই বলেছ। এইসব তথ্য তুমি কোথায় পেয়েছ তোমাকে বলতে হবে। এক্ষুনি বলতে হবে...

জগলু ভাই হয়তো আরো অনেক কিছু বলত, হুট করে লাইন কেটে গেল। আমি টেলিফোন সেট মাথার কাছে রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম। বাকি রাতে জগলু ভাই আর টেলিফোন করলেন না। আমি আর বাদল সকাল দশটা পর্যন্ত ঘুমালাম।

ঘুমের মধ্যে বাদল কোনো স্বপ্ন দেখল কি না আমি জানি না, তবে আমি নিজে দীর্ঘ স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নে আমার বাবা আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি কিছুক্ষণ পরপর আমার মাথা একটা চৌবাচ্চায় ডুবাচ্ছেন। চৌবাচ্চার পানি নাকমুখ দিয়ে ঢুকছে। ফুসফুস ফেটে যাবার মতো হচ্ছে। এর মধ্যেও তিনি অতি মধুর গলায় আমার সঙ্গে কথা বলছেন। আমার মাথা পানিতে ডোবানো। এই অবস্থায়ও আমি বাবার কথার জবাব দিতে পারছি। স্বপ্নে সবই সম্ভব।

বাবা বললেন, হিমালয় বাবা! কষ্ট হচ্ছে?

হুঁ।

বেশি কষ্ট হচ্ছে?

হুঁ।

স্বাভাবিকভাবে নিশ্বাস নেবার আনন্দটা কী, এখন বুঝতে পারছিস?

পারছি।

সহজভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাসেই যে মহাআনন্দ এটা বুঝতে পারছিস?

পারছি। এখন ছেড়ে দাও।

আর একটু।

নিশ্বাস নিতে দাও বাবা, মরে যাচ্ছি।

আর সামান্য কিছুক্ষণ, এই তো এক্ষুনি ছাড়ব।

বাবা তুমি আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছ কেন?

কষ্ট না পেলে আনন্দ বুঝবি কিভাবে?

বাবা আমি আনন্দ বুঝতে চাই না। আমি কষ্ট থেকে মুক্তি চাই।

আমি তোর শিক্ষক। আনন্দ কিভাবে পেতে হয় সেটা তোকে আমি না শেখালে কে শিখাবেরে বোকা ছেলে?



তিন.

আরব্য রজনীর সিন্দাবাদ সাহেব ঘাড়ে ভূত নিয়ে কতদিন হাঁটাহাঁটি করেছেন, তার উল্লেখ মূল বই-এ নেই। তবে আমি গত ছদিন সুটকেস-নামক ভূত নিয়ে হাঁটাহাঁটি করছি। যেখানে যাই হাতে স্যুটকেস। জগলু ভাইয়ের কোনো খোঁজ নেই। তিনি মোবাইল ধরছেন না। টেলিফোন করলেই প্রাণহীন নারীকণ্ঠ বলছে, এই মুহূর্তে সংযোগ দেয়া যাচ্ছে না। একটু পরে আবার চেষ্টা করুন। আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

খবরের কাগজ পড়া আমার স্বভাবের মধ্যে নেই, তার পরেও গত ছদিন খবরের কাগজ পড়লাম জগলু ভাইয়ের কোনো খবর পত্রিকায় এসেছে কি না জানার জন্য। তিনি কি র‍্যাবের হাতে ধরা পড়েছেন, এবং পরবর্তীতে ক্রসফায়ারে নিহত? চিতা নামের আরেক গ্রুপের খবর পাওয়া যাচ্ছে। এদের ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছে এরাও র‍্যাবের দূর-সম্পর্কের কাজিন। তাদের হাতে ধরা পড়লেও খবর আছে। এরাও ক্রসফায়ার বিষয়টা জানে।

পত্রিকায় গত সপ্তাহে এ-ধরনের কোনো খবর আসেনি। তা হলে জগলু ভাইয়ের ব্যাপারটা কী? এই টাইপের মানুষ সবসময় রিলে রেইসে থাকে। এদের হাত থেকে যে- কোনো সময় ব্যাটন পড়ে যেতে পারে। জগলু ভাইয়ের হাতের ব্যাটন কি পড়ে গেছে? অন্য একজন সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুটতে শুরু করেছে? রিলে রেইসের দৌড়বিদরা হারিয়ে যান, ব্যাটন হারায় না।

জগলু ভাইয়ের মোবইলে বাবু নাম এন্ট্রি করা আছে। বাদল বের করে

দিয়েছে। আমার ধারণা বাবু জগলু ভাইয়ের ছেলে। সেই নাম্বারে বাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। ছেলে কি পারবে বাবার কোনো খবর দিতে?

বুধবার দুপুরে জগলু ভাইয়ের ছেলেকে টেলিফোন করলাম। গম্ভীর এবং ভারী গলায় একটা বাচ্চা ছেলে বলল, তুমি কে?

আমি বললাম, আমি সম্পর্কে তোমার চাচা হই। তুমি জগলু ভাইয়ের ছেলে না?

হুঁ।

তোমার নাম কী?

আমার নাম হিমু।

আমার বাবা কোথায়?

আমি বললাম, জানি না তো কোথায়!

জানো না কেন?

তোমার কি বাবাকে খুব দরকার?

হ্যাঁ।

কীজন্যে দরকার বলো তো?

তোমাকে বলব না।

তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা আমার আছে। কাজেই আমাকে বলতে পারো। আমি উনাকে বলে দেব।

তুমি আর কাউকে বলবে না তো?

না।

প্রমিজ?

হ্যাঁ, প্রমিজ।

বাবা বলেছিল আমি জন্মদিনে যা চাই তা-ই আমাকে দেবে। তাকে বলার জন্যে আমি কী চাই!

তুমি কী চাও?

একটা ভূতের বাচ্চা চাই।

ছেলে-বাচ্চা, না মেয়ে-বাচ্চা?

ছেলে-বাচ্চা। আমি মেয়েদের পছন্দ করি না।

ভূতের ছেলে-বাচ্চা যোগাড় করা খুবই কঠিন। একেবারেই যদি যোগাড় করা না যায়, তা হলে কি মেয়ে-বাচ্চায় চলবে?

না চলবে না।

ভালো বিপদ হয়েছে তো!

এইজন্যেই আগে-আগে বললাম। জন্মদিনের তো দেরি আছে।

কত দেরি?

সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখ।

ভালো বিপদে পড়া গেল। এত অল্প সময়ে ছেলে-ভূতের বাচ্চা বের করা অতি জটিল ব্যাপার। আমার কলিজা পানি হয়ে যাবে।

তোমাকে কিছু করতে হবে না। বাবা করবে।

তোমার বাবা পারবে না। এইসব জটিল কাজের দায়িত্ব শেষটায় আমার ঘাড়েই এসে পড়বে। এখনো চিন্তা করে বলো মেয়ে-ভূত হলে চলবে কি না।

তোমাকে তো একবার বলেছি চলবে না। আমি আর তোমার সঙ্গে কথা বলব না। বেশি কথা বলা আমার নিষেধ। ডাক্তার সাহেব নিষেধ করেছেন। আমার অসুখ তো এইজন্যে।

তা হলে বিদায়।

বিদায়।

হ্যালো শোনো ভূতের বাচ্চা দিয়ে কি করবে?

খেলব।

সে ঘুমাবে কোথায়?

আমার সঙ্গে ঘুমাবে।

ভয় পাবে তো।

ভয় পাব না। ভূতের বাচ্চারা ভাল হয়। তারা ভয় দেখায় না। আমি এখন আর তোমার সঙ্গে কথা বলব না।

বাবুর সঙ্গে কথা বলার পরপরই মিতুর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করল। তাকে কিছুক্ষণ বিরক্ত করা। একটু রাগিয়ে দেয়া। এই মেয়েটা এখন আমার টেলিফোন পেলেই রেগে যাচ্ছে। সাধারণ রাগ না, ভয়াবহ টাইপ রাগ। মানুষের স্বভাব হলো, কেউ যখন ভালোবাসে তখন নানান কর্মকাণ্ড করে সেই ভালোবাসা বাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে, আবার কেউ যখন রেগে যায় তখন তার রাগটাও বাড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করে।

হ্যালো, মিতু!

আপনি আবার টেলিফোন করেছেন? আবার? আপনাকে আমি কী বলেছি, কখনো টেলিফোন করবেন না। নেভার এভার।

খুব জরুরি কাজে টেলিফোন করেছি। খুব জরুরি বললেও কম বলা হবে। জরুরির ওপর জরুরি। মহা জরুরি...

আমার সঙ্গে আপনার কী জরুরি কাজ?

একটা তথ্য যদি দিতে পার।

কী তথ্য?

ভূতের বাচ্চা কোথায় পাওয়া যায় বলতে পারবে?

কিসের বাচ্চা?

ভূতের ছেলে-বাচ্চা। একান্তই যদি না পাওয়া যায় মেয়ে-বাচ্চা হলেও চলবে। তবে আমার দরকার ছেলে-বাচ্চা।

আপনি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করার জন্যে টেলিফোনটা করলেন?

রসিকতা না। আসলেই আমার একটা ভূতের ছেলে-বাচ্চা দরকার। একজনকে কথা দিয়েছি। সে পালবে।

হিমু সাহেব শুনুন। আপনার হাত থেকে উদ্ধারের জন্য আমি একটা ব্যবস্থা নিচ্ছি। আমি আমার টেলিফোন সেট আর ব্যবহার করব না। আপনি চেষ্টা করেও আর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন না। তা ছাড়া এই মঙ্গলবারে আমি বাবাকে নিয়ে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছি। এমনিতেও যোগাযোগ হবে না।

স্যার কি ভালো আছেন?

হ্যাঁ, বাবা ভালো আছেন।

তোমরা চলে যাবে, তার আগে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না?

দেখা হবার কোনো প্রয়োজন কি আছে?

না, প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন ছাড়াও কিন্তু আমরা অনেক কিছু করি।

কী করি?

এই ধরো আমার টেলিফোন পাওয়ামাত্রই তুমি কিন্তু নিজের টেলিফোন অফ করে দিতে পারতে। তা করনি। প্রয়োজন ছাড়াই অনেকক্ষণ কথা বলেছ, এখনো বলছ।

এটা ভদ্রতা।

আমি যে স্যারের সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছি এটাও ভদ্রতা। তুমি কি বাসায় আছ?

কেন?

তা হলে এখনই চলে আসি, 'ভদ্রতা'র ঝামেলা সেরে ফেলি। মঙ্গলবারের পর তোমাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। শেষ দেখাটা হোক।

ঠিক আছে, আসুন। এক ঘণ্টার মধ্যে আসবেন। আমি এক ঘণ্টা পর বাবাকে নিয়ে বের হব।

আমি একটা ক্যাব নিয়ে চলে আসি?

ক্যাব নিয়ে আসবেন, নাকি হেলিকপ্টার ভাড়া করে আসবেন—সেটা আপনার ব্যাপার।

আমার একার ব্যাপার না। তোমারও ব্যাপার।

আমার ব্যাপার কীভাবে?

ক্যাবেই আসি বা হেলিকপ্টারেই আসি ভাড়া তো তোমাকেই দিতে হবে। আমার হাত খালি।

আবার রসিকতা! আবার!

আমি টেলিফোন অফ করে উঠে দাঁড়ালাম। আমার হাতে সুটকেস। সুটকেসে পঁচিশ লক্ষ টাকা। কোনো ছিনতাইকারী আমাকে একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে সুটকেস নিয়ে দৌড় দিচ্ছে না কেন? দেশ থেকে কি ছিনতাই উঠে গেছে?

মেস থেকে বেরুবার সময় মেসের ম্যানেজার বদরুলের সঙ্গে দেখা। বদরুল বলল, হিমু ভাইরে সব সময় দেখি সুটকেস লইয়া ঘুরেন। সুটকেসে আছে কী?

আমি বললাম, টাকা।

কত টাকা?

পঁচিশ লক্ষ টাকা।

বদরুল শব্দ করে হাসা শুরু করল। তার হাসি দেখে মনে হচ্ছে এমন মজার কথা সে আগে কখনো শোনেনি। বদরুল আবার কাকে ডেকে যেন বলছে, হিমু ভাইয়ের সুটকেস- ভরতি টাকা। হা হা হা। পঁচিশ লক্ষ টাকা। হা হা হা।

মিতু সরুচোখে আমার সুটকেসের দিকে তাকিয়ে আছে। মনসুর সাহেবও তাকিয়ে আছেন। পিতা-কন্যা নিজেদের মধ্যে চোখাচোখিও করলেন। মিতু বলল, সুটকেসটা পরিচিত মনে হচ্ছে।

আমি বললাম, তোমার সুটকেস, পরিচিত মনে হবারই তো কথা।

সুটকেসটা কি ফেরত দিতে এসেছেন?

না। মঙ্গলবার পর্যন্ত তোমার কাছে রেখে যেতে এসেছি। তোমাদের ফ্লাইট কখন?

বিকালে।

আমি সকালে এসে সুটকেস নিয়ে যাব।

মনসুর সাহেব বললেন, ব্যাগে কি টাকা?

জি স্যার। জগলু ভাইকে টাকাটা এখনো দেওয়া হয়নি। আমি সুটকেস নিয়ে নিয়ে ঘুরছি। কয়েকটা দিন ঝাড়া হাত-পা হয়ে ঘুরতে চাই। সুটকেস-হাতে হাঁটা যায় না। রিকশা নিতে হয়। আমার কাছে রিকশা ভাড়া থাকে না।

পিতা-কন্যা দুজনই এখন একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। পিতার দৃষ্টিতে ভয়। কন্যার দৃষ্টিতে বিস্ময়।

মনসুর সাহেব শান্ত গলায় বললেন, হিমু। আমি তোমার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, কোন ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না?

কিছুই বুঝতে পারছি না। বুঝতে চাচ্ছিও না। আমি খুব খুশি হব তুমি যদি আমাদের জীবন থেকে অফ হয়ে যাও।

মঙ্গলবারের পর অফ হই স্যার? মঙ্গলবার পর্যন্ত সুটকেসটা রাখুন। এই কয়টাদিন আমি অত্যন্ত ব্যস্ত থাকব। নানান জায়গায় ছোটাছুটি করতে হবে। সুটকেস-হাতে ছোটাছুটি করা যাবে না।

কী নিয়ে ব্যস্ততা?

ভূতের বাচ্চা খুঁজতে হবে। ছেলে-বাচ্চা। একজনের ফরমায়েশ। তাকে একটা ছেলে- ভূতের বাচ্চা দিতে হবে।

পিতা-কন্যা আবারও মুখ-চাওয়াচাওয়ি করছেন। আমি তাঁদের সামনে সুটকেস রেখে চলে এলাম। ঘাড় থেকে ভূত নামাবার জন্যে সিন্দাবাদকে নানান কায়দাকানুন করতে হয়েছিল। আমাকে কিছু করতে হয়নি। যাদের ভূত তাদেরকে দিয়ে এসেছি।

আমি লক্ষ করেছি প্রকৃতি কাকতালীয় বিষয়গুলো পছন্দ করে। মনসুর সাহেব আমাকে বললেন, 'আমি খুব খুশি হব তুমি যদি আমাদের জীবন

থেকে অফ হয়ে যাও।' ঠিক একই বাক্য কিছুক্ষণের মধ্যেই যদি আরো একজন বলে তাকে কি কাকতালীয় বলা যাবে না? বাক্যের কোনো শব্দ এদিক-ওদিক নেই।

মনসুর সাহেব আমাকে যা বলেছিলেন খালুসাহেব হুবহু তা-ই বললেন। মনসুর সাহেব শান্ত গলায় বলেছিলেন। খালুসাহেব বললেন সামান্য অস্থির ভঙ্গিতে। বেশকম বলতে এইটুকুই।

হিমু, আমি খুব খুশি হব তুমি যদি আমাদের জীবন থেকে অফ হয়ে যাও।

আমি বসে আছি খালুসাহেবের অফিসে, ঠিক তাঁর সামনে। খালুসাহেব মাসে মাসে আমাকে কিছু হাতখরচ দেন। একটাই শর্ত, আমি বাদলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব না। এই মাসে শর্ত পালন করা হয়নি। বাদলের সঙ্গে একই কামরায় একরাত কাটিয়েছি।

আমি কী বলছি শুনতে পেয়েছ?

জি খালুসাহেব।

তুমি আমাদের জীবন থেকে পুরোপুরি অফ হয়ে যাবে।

মাঝেমধ্যে অন হতে পারব না? ধরুন ঈদের চান্দে অন হলাম। বাকি সময়টা অফ।

কখনো না। নেভার।

হাতখরচ নেবার জন্যেও কি আসব না?

হাতখরচের কথা ভুলে যাও। তুমি যে-অপরাধ করেছ তারপর হাতখরচ দেয়া দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পোষার চেয়েও খারাপ।

আমি কী করেছি?

তোমার ধারণা তুমি কিছু করনি?

জি না। বরং বাদলের মাথা থেকে গানটা দূর করে দিয়েছি। বাদল আপনাকে বলেনি?

বলেছে।

তা হলে আপনি আমার ওপর রাগ করছেন কেন?

তুমি বাদলের মাথা থেকে গান তুলে এনে আমার মাথায় পুঁতে দিয়েছ, কাজটা তুমি করেছ ইচ্ছা করে। কারণ, আমি তোমাকে চিনি। আমার চেয়ে ভাল করে তোমাকে কেউ চেনে না।

আপনার মাথায় কোন গান ঢুকিয়েছি? পাগলা হাওয়া?

হাওয়া-ফাওয়া না, হিন্দি গানটা। সাঁইয়া দিল মে আনা... আমি এই গান জীবনে কোনোদিন শুনিনি। সেদিন অফিসে আসার সময় ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়েছি। এক রেস্টুরেন্টে গানটা বাজছিল। পুরোটা শুনলাম। তার পর থেকে গান মাথায় বাজছে।

বের করার ব্যবস্থা করে দেব?

তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি সামনে থেকে যাও।

চা-নাশতা খেয়ে যাই। আপনার অফিস থেকে চা-নাশতা না খেয়ে গিয়েছি, এরকম মনে পড়ে না।

এখন থেকে মনে পড়বে। যাও বিদায় হও।

চা-নাশতা নাহয় না-ই খেলাম, এক গ্লাস পানি খেয়ে যাই?

পানিও না। আমার অফিস এখন থেকে তোমার জন্যে কারবালা।

আমি মুখ যথাসম্ভব করুণ করে বললাম, তা হলে কি চলে যাব?

খালুসাহেব বললেন, ভাগো হিঁয়াসে।

হিন্দি গালির পর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। তার পরেও দাঁড়িয়ে আছি। খালুসাহেবের রাগের শেষ পর্যায়টা দেখতে ইচ্ছা করছে। শেষ পর্যায়ে এসে কী করবেন? ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবেন? দারোয়ান ডাকবেন? আরেকটা সম্ভাবনা আছে, ধপ করে রাগ পড়ে যেতে পারে। মানুষের মস্তিষ্ক তীব্র আবেগ বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে না। তীব্র আবেগের উচ্চ- স্তর থেকে মস্তিষ্ককে নামতেই হবে।

মনে হচ্ছে খালুসাহেব সেই তীব্র পর্যায়ে এখনো পৌঁছাননি। এখন তিনি চোখ সরু করে তাকিয়ে আছেন। মুখ সামান্য হাঁ-করা। মুখ থেকে হিসহিস জাতীয় শব্দ হচ্ছে। আমি কি খালুসাহেবকে আবেগের অতি উচ্চস্তরে পৌঁছানোর ব্যাপারে সাহায্য করব? এখন তাঁকে অতি সহজ ভঙ্গিতে উলটাপালটা দুএকটা কথা বললেই হবে।

কী ব্যাপার, দাঁড়িয়ে আছ যে?

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, খালুসাহেব, আমি দাঁড়িয়ে আছি না তো! আমি এখনো বসে আছি। আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে আমি দাঁড়িয়ে আছি? তা হলে তো আপনার প্রেশার হাই হয়েছে। আপনার প্রেশারটা মাপানো দরকার।

তুমি বসে আছ?

জি খালুসাহেব। আমি আপনার সামনের চেয়ারটায় বসে আছি। কিছুক্ষণ আগেও পা নাচাচ্ছিলাম, আপনার রাগ দেখে পা নাচানো বন্ধ করেছি।

খালুসাহেব হকচকিয়ে গেলেন। তিনি চোখে দেখছেন আমি দাঁড়িয়ে আছি (তা-ই দেখার কথা, আমি দাঁড়িয়েই আছি), অথচ আমার কথাও ফেলতে পারছেন না।

খালুসাহেব, আমি চলে যাচ্ছি। আপনিও বাসায় চলে যান। রেস্ট নিন। ঘুমের ওষুধ খেয়ে টানা ঘুম দেন। এখনো কি আপনার কাছে মনে হচ্ছে আমি দাঁড়িয়ে আছি?

হুঁ।

আমার ধারণা, আপনার মস্তিষ্ক অতিরিক্ত উত্তেজিত। আমার উপস্থিতি সম্ভবত আপনার মস্তিষ্ক নিতে পারছে না। আমি বরং চলে যাই।

না, তুমি বসো।

আমি তো বসেই আছি।

বসে আছ?

জি।

খালুসাহেব বিড়বিড় করে বললেন, ও মাই গড! বলেই চোখ বন্ধ করলেন। আমি তৎক্ষণাৎ চেয়ারে বসে পড়লাম। খালুসাহেব চোখ মেলে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে ভীতগলায় বললেন, তুমি কি এখন বসে আছ? না-কি দাঁড়িয়ে আছ?

আপনার কাছে কি এখনো মনে হচ্ছে আমি দাঁড়িয়ে আছি?

তিনি জবাব দিলেন না। বড় করে নিশ্বাস ফেললেন। আমি বললাম, আপনার প্রেশারটা তো মনে হয় মাপানো দরকার। আমি কি ফার্মেসি থেকে কোনো-একজনকে প্রেশার মাপার জন্যে ধরে নিয়ে আসব?

খালুসাহেব ক্ষীণগলায় বললেন, আরো কিছু সময় পার হোক। তুমি এখন বসে আছ না দাঁড়িয়ে আছ?

বসে আছি।

একটু দাঁড়াবে?

অবশ্যই দাঁড়াব।

আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, আপনার কাছে কি এখনো মনে হচ্ছে আমি বসে আছি?

না।

তা হলে তো মনে হয় আপনি ঠিক হয়ে গেছেন। খালুসাহেব আমি যাই।

যাই-যাই করছ কেন? বসো।

জি আচ্ছা। চা দিতে বলুন। চা খাই। চায়ের সঙ্গে নাশতা। সকালে কিছু খাইনি।

খালুসাহেব বেল টিপে বেয়ারাকে চা-নাশতার কথা বললেন।

আমি চা খাচ্ছি। খালুসাহেব আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তবে এখন তাঁর দৃষ্টি স্বাভাবিক। মস্তিষ্ক মনে হয় অতি উত্তেজিত অবস্থা থেকে নরমাল অবস্থায় দ্রুত ফিরে আসছে।

হিমু!

জি খালুসাহেব?

প্রশ্ন করলে সত্যি জবাব দেবে?

অবশ্যই। আমি নিতান্ত প্রয়োজন না হলে মিথ্যা বলি না।

খালুসাহেব সিগারেট ঠোঁটে নিয়ে দেয়াশলাই জ্বালিয়ে ধরালেন। প্রথমবারে পারলেন না। কয়েকটা কাঠি নষ্ট হলো। সিগারেটে লম্বা লম্বা টান দিয়ে নাকে-মুখে ধোঁয়া বের করতে করতে বললেন, তুমি আমার কাছে চা খেতে চেয়েছিলে, আমি না করে দিলাম। অফিস থেকে বের করে দিতে চেয়েছিলাম। তখন তুমি ঠিক করলে যে-করেই হোক তুমি অফিসে থাকবে। চা-নাশতা খাবে। তারপর মাসের টাকাটা নিয়ে বিদেয় হবে। তোমার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে তুমি একটা কৌশল বের করলে। আমাকে বিভ্রান্ত করলে। আমি কি ঠিক বলছি?

জি খালুসাহেব।

দাঁড়িয়ে থাকা বসে থাকার খেলা খেললে। দাঁড়িয়ে থেকেও বললে বসে আছি। ঠিক বলেছি?

জি খালুসাহেব।

তুমি যে অতি বিপজ্জনক একটি প্রাণী তা কি তুমি জানো?

না খালুসাহেব, এটা জানি না।

তুমি অতি বিপজ্জনক।

খালুসাহেব মানিব্যাগ খুলে টাকা বের করতে করতে বললেন, তোমার মাসিক অ্যালাউন্স আমি দিয়ে দিচ্ছি, এখন চলে যাও।

জি আচ্ছা।

প্রতিমাসের দুই তারিখে এসে টাকা নিয়ে যেও, আমি তোমার অ্যালাউন্স বন্ধ করব না।

থ্যাঙ্ক য়্যু।

তবে তুমি আমার কাছে আসবে না। আমার সেক্রেটারির কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাবে।

জি আচ্ছা।

খালুসাহেব সিগারেটে শেষ লম্বা টান দিয়ে সিগারেট অ্যাশট্রেতে রাখতে রাখতে বললেন, এখন তোমাকে অতি ভদ্রভাবে বলছি চলে যাও। নো হার্ড ফিলিংস।

আমি খালুসাহেবের অফিস থেকে সরাসরি চলে এলাম রমনা পার্কে।

দুপুরে ঘুমানোর জন্যে রমনা পার্ক অতি উত্তম জায়গা। এই সময় পার্ক থাকে ফাঁকা। যে- কোনো একটা খালি বেঞ্চের দখল অতি সহজেই নেওয়া যায়। মাথার ওপর ঘন পাতার গাছ দেখে বেঞ্চ খুঁজে নিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়া। মাথা-মালিশের ছেলেপুলে দুপুরবেলায় বেশি ঘুরঘুর করে। তাদের কোনো-একজনকে ডেকে নিলে আরামের ষোলোকলা পূর্ণ হবে। এরা ঘণ্টা হিসেবে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। পাঁচ টাকা করে ঘণ্টা।

এখন আমার মাথার ওপর দুটা বড় সাইজের ছাতিম গাছ। ছাতিম গাছের পাতার ছায়া পড়েছে বেঞ্চে। আমি পা লম্বা করে শুয়ে আছি। আমার মাথায় ঝাঁঝালো সরিষার তেল মালিশ করে দিচ্ছে জিতু মিয়া। তার দায়িত্ব শুধু তেল মালিশ করা না, আমি যেন নির্বিঘ্নে দুই ঘণ্টা ঘুমুতে পারি সেই ব্যবস্থা করা। জিতু মিয়া বলেছে, ভাইজান 'লিচ্চিন্ত' থাহেন।

আমি 'লিচ্চিন্ত' আছি।

জিতু মিয়া মাথা-মালিশের ব্যাপারে এক্সপার্ট বলেই মনে হচ্ছে। নানানভাবে দলাইমলাই করছে। আমার চোখ ভারী হয়ে আসছে। ঘুমিয়ে

পড়লে মাথা-মালিশের আরাম থেকে বঞ্চিত হব বলে প্রাণপণে জেগে থাকার চেষ্টা করছি। জিতুর সঙ্গে টুকটাক কথাও বলছি।

দুপুরে খাওয়াদাওয়া হয়েছে?

নাহ্।

কিছু রোজগার হয় নাই?

নাহ্।

আমি প্রথম কাস্টমার?

সকালে একজন পাইছিলাম। হে খারাপ কাজ করতে চায়।

তোর কি চুরির অভ্যাস আছে?

অল্পবিস্তর আছে।

চুরিটা করিস কখন? কাস্টমার ঘুমিয়ে পড়লে?

জিতু মিয়া ফিক করে হেসে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, আমার পকেটে মোবাইল টেলিফোন আছে। টাকা আছে। চুরি যদি করিস মোবাইলটা নিস না। অন্যের জিনিস।

আপনি লিচ্চিন্তে ঘুমান। আপনের জিনিস নিমু না।

নিবি না কেন?

আফনেরে চিনি। আফনে হইলদা সাধু।

আমার নাম জানিস?

আপনে হিমু ভাইজান। আপনে কতবার পার্কে আইসা ঘুম গেছেন। একবার আপনের পকেট থাইক্যা সাতশ টাকা চুরি গেছিল।

তুই নিয়েছিলি?

আমার ভাই নিছিল।

সে কই?

তার খুঁজ নাই।

তোরা কি দুই ভাই।

একটা ভইনও আছে।

নাম কি বোনের?

কালিমা।

কালিমা কীরকম নাম? গায়ের রং কালো?

কালো না, ময়লা।

বোন থাকে কই?

তারও খুঁজ নাই।

এখানে দুপুরে খাওয়াদাওয়া কী পাওয়া যায়?

সবই পাওয়া যায়। ভাত-মাছের হোটেল আছে, কাচ্চি বিরিয়ানি, মোরগপোলাও আছে।

তোর কোনটা পছন্দ? ভাত-মাছ, না মোরগপোলাও, কাচ্চি বিরিয়ানি?

মোরগপোলাও।

আমি ঘুমিয়ে পড়লে পকেট থেকে টাকা নিয়ে মোরগপোলাও খেয়ে আসবি।

আফনে ঘুম থাইক্যা উঠেন, তার পরে খামুনে।

সেটাও খারাপ হয় না। আমিও দুপুরে কিছু খাইনি, একসঙ্গে খাব। এরা মোরগপোলাও রাঁধে কেমন?

জব্বর রান্ধে। এক মাইল দূর থাইক্যা বাস আসে।

এই জিনিস খেয়ে দেখা দরকার। ঘুম থেকে উঠে নেই, ডাবল মোরগপোলাও খাব।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। ঘুম ভাঙল মোবাইলের শব্দে। গানের মতো সুরে পকেটে মোবাইল বাজছে। কানে ধরতেই জগলু ভাইয়ের কঠিন গলা শোনা গেল, মোবাইল ধরো না কেন? রিংয়ের পর রিং হচ্ছে, ধরছ না।

আমি মধুর গলায় বললাম, কেমন আছেন জগলু ভাই?

মোবাইল ধরতে এতক্ষণ লাগল কেন?

ঘুমাচ্ছিলাম জগলু ভাই।

আমার জিনিস কোথায়?

সেইফ জায়গায় আছে।

তুমি কোথায়?

পার্কে।

কোথায়?

পার্কে। রমনা পার্কে।

পার্কে কি কর।

ঘুমাচ্ছি।

পার্কে ঘুমাচ্ছ?

ঘুমাবার জন্য অতি উত্তম জায়গা জগলু ভাই। সব ধরনের মানুষের ঘুমানোর ব্যবস্থা আছে।

ঠিক কোন জায়গায় আছ বলো, আমি দশ মিনিটের মধ্যে উপস্থিত হব। জিনিস নিয়ে যাব।

আপনি এতদিন ছিলেন কোথায়?

আমি এতদিন কোথায় ছিলাম সেটা দিয়ে তোমার দরকার নেই।

দুপুরে কি খাওয়াদাওয়া করেছেন? খাওয়াদাওয়া না করলে আমার সঙ্গে খেতে পারেন। এখানে অসাধারণ মোরগপোলাও পাওয়া যায়, যার সুঘ্রাণ এক মাইল দূর থেকে পাওয়া যায়।

তুমি কোথায় আছ, আমি কোন গেট দিয়ে ঢুকব সেটা বলো।

আপনি একা আসবেন? না সঙ্গে লোকজন থাকবে?

কোনো বাড়তি কথা না। যেটা জানতে চাচ্ছি সেটা বলো।

আঙুল-কাটা জগলু ভাই আমার পাশে বেঞ্চিতে বসে আছেন। তাঁর চুল সুন্দর করে আঁচড়ানো। চোখে সানগ্লাস। ইস্ত্রি-করা হালকা সবুজ রঙের শার্ট ইন করে পরেছেন। প্যান্টের রং ধবধবে সাদা। পায়ের কালো জুতা চকচক করছে। মনে হচ্ছে এখানে আসার আগে বুট-পালিশওয়ালাকে দিয়ে জুতা পালিশ করিয়েছেন। গায়ে সেন্ট মেখেছেন। তবে সেন্টের গন্ধ ভালো না। নাকে লাগছে।

জগলু ভাইয়ের বসে থাকার মধ্যে হতভম্ব ভাব আছে। মনে হচ্ছে তিনি জমে পাথর হয়ে গেছেন। সুটকেস মনসুর সাহেবের বাসায় রেখে এসেছি শোনার পর থেকে তাঁর এই অবস্থা।

জিতু মিয়াকে তিন ডাবল মোরগপোলাও আনতে পাঠিয়েছি। সে বলেছে আনতে দেরি হবে। ফ্রেশ রান্না করিয়ে আনবে। আমি এবং জগলু ভাইয়ের আশপাশে কেউ নেই। তার পরেও জগলু ভাই যে চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন তা বোঝা যাচ্ছে। তিনি একা আসেননি। তাঁর সঙ্গে আরো দুজন আছে। এই দুজনের কাউকেই আগে দেখিনি। এরা দূর থেকে জগলু ভাইয়ের দিকে লক্ষ রাখছে।

তুমি সুটকেস মনসুর সাহেবের বাসায় রেখে এসেছ?

জি। আপনার কোনো খোঁজ পাচ্ছি না, এই জিনিস নিয়ে কোথায় কোথায় ঘুরব?

তুমি এক্ষুনি এই মুহূর্তে আমার জিনিস এনে দেবে। যদি না পার তোমার কিন্তু সময় শেষ।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, এনে দেব। কোনো অসুবিধা নেই।

বসে আছ কেন? উঠে দাঁড়াও।

জিনিস নিয়ে কি আমি পার্কে আসব? আপনারা এইখানে অপেক্ষা করবেন?

জগলু ভাই জবাব দিলেন না। সিগারেট ধরালেন। আমি বললাম, ভালোমতো চিন্তাভাবনা করে বলুন।

তুমি এইখানেই নিয়ে আসবে।

ঠিক আছে। খাওয়াদাওয়া করে তারপরে যাই। আপনার জন্যেও মোরগপোলাও আনতে পাঠিয়েছি।

তুমি এক্ষুনি যাবে। এই মুহূর্তে।

আমি উদাস গলায় বললাম, জগলু ভাই, আমি না খেয়ে যাব না।

তোর বাপ যাবে।

আমি সহজ গলায় বললাম, আমার বাপও যাবে না। তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব না। আর আমি নিজেও যাব না। আসুন খাওয়াদাওয়া করি, তারপর ব্যবস্থা করছি। খাওয়াদাওয়া করলে আপনার নিজের মেজাজও ঠাণ্ডা হবে। ঠাণ্ডা মাথায় আমরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব।

তোকে এখনই গুলি করে মেরে ফেলব, হারামজাদা।

এখন মেরে ফেললে সুটকেস কে এনে দেবে?

শুয়োরের বাচ্চা, চুপ।

আমি জগলু ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, তুই চুপ।

জগলু ভাই হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকালেন। তিনি মনে হয় তাঁর সমস্ত জীবনে এত বিস্মিত হননি। আমি ঠিক আগের মতো ভঙ্গিতে বললাম, মোরগপোলাও আসছে, সোনামুখ করে মোরগপোলাও খাবি। বুঝেছিস? তেড়িবেড়ি করলে থাপ্পড় খাবি।

জিতু মিয়া খাবার নিয়ে আসছে। তার মুখ হাসিহাসি। আমি জগলু ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, খাওয়ার পর পান খাওয়ার অভ্যাস আছে?

তোর জন্যে পান আনিয়ে রাখব? এরকম করে তাকাচ্ছিস কেন? তোকে এর আগে কেউ তুই করে বলে নাই?

জগলু ভাই মোরগপোলাও খাচ্ছেন। আগ্রহ করেই খাচ্ছেন। তাঁর চেহারা থেকে হতভম্ব ভাবটা অনেকখানি কেটেছে। আমি বললাম, মোরগপোলাওটা ভালো না জগলু ভাই?

তিনি বললেন, হুঁ।

আমি বললাম, আপনার ছেলেরও তো মোরগপোলাও পছন্দ।

জগলু ভাই বলল, তুমি জানলে কীভাবে?

আমার সঙ্গে কথা হয়। সে জন্মদিনে মোরগপোলাও খাবে বলে বলেছে। আমরা এই বাবুর্চিকেই অর্ডার দিয়ে রাখি?

জগলু ভাই বললেন, ওর সঙ্গে তোমার আর কী কথা হয়েছে?

জন্মদিনে সে কী উপহার চায় সেটা আপনাকে বলতে বলেছে।

কী উপহার চায়?

একটা ছেলে-ভূতের বাচ্চা চায়। খেলনা না। আসল জিনিস।

ছেলে-ভূতের বাচ্চা আমি পাব কোথায়? এটা তার মাথায় আসলো কেন? তোমার সঙ্গে কি তার প্রায়ই কথা হয়।

মাঝে মাঝে হয়। আপনার সঙ্গে কথা হয় না?

না।

টেলিফোন করেন না কেন?

টেলিফোন করলেই তাকে দেখতে যেতে বলবে। সেটা কখনো পারব না।

পারবেন না কেন?

পুলিশের ইনফরমার সবসময় নজর রাখছে। ফোন করলেই ধরা পড়ব। মতিকে পাঠিয়েছিলাম। পুলিশ তাকেও ধরে নিয়ে গেছে। কোথায় নিয়ে গেছে জানি না। মনে হয় মেরেই ফেলেছে।

খাওয়া শেষ করে জগলু ভাই পান খেলেন। সিগারেট ধরালেন। তাঁর চেহারায় কিছুক্ষণের জন্য হলেও একটা সুখী-সুখী ভাব চলে এল। আমি বললাম, জগলু ভাই একটা কাজ করুন লম্বা হয়ে বেঞ্চীতে শুয়ে পড়ুন।

কেন?

জিতু মিয়া আপনার মাথা মালিশ করে দেবে। মাথা মালিশে ডিগ্রী দেবার ব্যবস্থা থাকলে এই বিষয়ে সে Ph.D. পেয়ে যেত। জিতু আপনার মাথা মালিশ করবে আপনি পাঁচ-দশ মিনিটের তোফা ঘুম দেবেন। দুপুরের ঘুমটাকে কি বলে জগলু ভাই?

সিয়াস্তা!

আপনি সিয়াস্তায় চলে যাবেন। আমি আপনার কানের কাছে রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা আবৃত্তি করব।

তুমি রবার্ট ফ্রস্ট জান?

কয়েকটা জানি। আপনি শুনলে অবাক হবেন আমার বাবা আপনার মতই ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন। আপনাকে কি দুই-এক লাইন রবার্ট ফ্রস্ট শুনাব?

না। তুমি জিতু মিয়াকে সামনে থেকে যেতে বল।

সে তো আপনার সামনেই বসে আছে।

জগলু ভাই জিতু মিয়ার দিকে তাকিয়ে কঠিন ধমক দিলেন— যা ভাগ লাথি দিয়ে কোমড় ভেঙ্গে ফেলব।

জিতু মিয়া মুখ শুকনা করে উঠে চলে গেল। আমি বললাম, জগলু ভাই জনগণের সঙ্গে আপনার ব্যবহার তো খুবই ভাল।

তিনি আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরালেন। আমি বললাম, জগলু ভাই টপ টেরার হতে হলে কি কি গুণাবলী লাগে একটু বলবেন?

কেন?

কৌতূহল। এর বেশি কিছু না। আমি নিজে চিন্তা করে কয়েকটা পয়েন্ট বের করেছি। আপনার সঙ্গে মিলে কি-না বুঝতে পারছি না। বলব?

বল শুনি।

প্রথমেই লাগে খারাপ বাবা-মা। একটা ভাল বাবা এবং একটা খারাপ মা কখনো সন্ত্রাসী ছেলের জন্ম দিতে পারেন না।

জগলু ভাই হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে বললেন, তুমি তোমার স্বভাব মত আমার সঙ্গে ফাইজলামী করছ। এটা আর করবে না।

জ্বি আচ্ছা করব না।

আমার বাবা-মা আদর্শ মানুষ ছিলেন। বাবা ছিলেন নান্দিনা হাই স্কুলের অংকের শিক্ষক। বাবার যে কোন একজন ছাত্রকে ডেকে তুমি যদি বল— অংক বদরুলকে চেন? সেই ছাত্র চোখের পানি ফেলে দেবে।

উনার নাম অংক বদরুল?

হুঁ। বাবা কি রকম মানুষ ছিল শুনতে চাও?

চাই।

বাবাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করত আপনার ছেলে-মেয়ে কি? বাবা বলত আমার দুই মেয়ে, পুত্র সংখ্যা কয়েক হাজার। বাবা তার সব ছাত্রকে পুত্র মনে করত। পনেরো-বিশ বছরের পুরাতন ছাত্রদের নামও বাবার মনে থাকত। একটা ঘটনা বলি শোন— বাবার সঙ্গে নিউমার্কেট কাঁচা বাজারে গিয়েছি। এক লোক বিশাল সাইজের একটা কাতল মাছ কিনছে। সম্ভবত বাজারের সবচে বড় কাতল। তার চারদিকে ভিড় জমে গেছে। বাবা ভিড় ঠেলে লোকটার কাছে গিয়ে বললেন, তুই মাসুদ না? তোকে একবার চড়-মেরেছিলাম মনে আছে? এক থাপ্পর খেয়ে তোর জ্বর এসে গেল। ঐ লোক সঙ্গে সঙ্গে বাবার পায়ে পড়ে গেল। তাকে টেনে তোলা যায় না এমন অবস্থা।

আমি বললাম, তারপর ঐ লোক কি করল? কাতল মাছটা আপনাদের বাড়িতে দিয়ে গেল?

তুমি জান কিভাবে?

অনুমান করছি।

এখানে অনুমানের কোনো ব্যাপারই নাই। অবশ্যই এই ঘটনা তুমি জান। কিভাবে জান বল। এই মুহূর্তে বল।

জগলু ভাই আপনি খামাখা উত্তেজিত হচ্ছেন। আমি অনুমানে বলছি।

অনুমানটা করলে কিভাবে?

আপনার বাবার একজন ছাত্র আপনার বাবাকে দেখে তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করেছে এটা তো কোনো বড় ঘটনা না। একজন প্রিয় শিক্ষকের দেখা পেলে সব ছাত্ররাই এ রকম করবে। ঐ ছাত্র বিশাল কাতল মাছটা আপনাদের বাড়িতে পৌছে দিয়েছে এটাই ঘটনা। এই কারণেই আপনি ঘটনাটা মনে রেখেছেন।

তোমার যুক্তি ঠিক আছে।

আমি বললাম, আপনার বাবা কি আপনার উত্থান দেখে যেতে পেরেছেন?

জগলু ভাই জবাব দিলেন না। আমি বললাম, জগলু ভাই আপনি আপনার বাবার গল্প খুব আনন্দ নিয়ে করেছেন। গল্পের একটা পর্যায়ে দেখলাম আপনার চোখ চিকচিক করছে। বাবার গল্প করে যে আনন্দ আপনি পেয়েছেন সেই আনন্দ কিন্তু আপনার ছেলে বাবু পাবে না। আপনাকে নিয়ে কোনো গল্প করতে গিয়ে তার চোখ চক চক করবে না।

উপদেশ দিচ্ছ?

জ্বি না।

থাপ্পর দিয়ে তোর দাঁত ফেলে দিব হারামজাদা।

দাঁত ফেলে দেবেন?

অবশ্যই দাঁত ফেলে দেব। তুই লেকচার কপচাচ্ছিস। তুই আমাকে মরালিটি শিখাস? একটা সোসাইটিতে সব ধরনের মানুষ থাকবে। সাধু-সন্ন্যাসী যেমন থাকবে, চোর-ডাকাতও থাকবে। সন্ন্যাসী থাকবে, চাঁদাবাজ থাকবে। তুই জঙ্গলে কখনও ঢুকেছিস। জঙ্গলে ফলের গাছ যেমন আছে—কাঁটা গাছও আছে।

ফুলের বাগানে কিন্তু শুধু ফুল গাছেই আছে।

ঐ ফুলের বাগান মানুষের তৈরি প্রকৃতির তৈরি না।

প্রকৃতি সব দিয়েছে যাতে আমরা মানুষরা বিচার-বিবেচনা করে ভাল-মন্দ আলাদা করতে পারি।

চুপ।

জগলু ভাই উঠে দাঁড়ালেন। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। জগলু ভাই থমথমে গলায় বললেন, তুই যাচ্ছিস কোথায়?

আপনাকে স্যুটকেসটা দিতে হবে না? চলুন আমার সঙ্গে স্যুটকেস রিলিজ করে আপনার হাতে হাতে দিয়ে দেই।

চল।

মাঝখানে শুধু দুই মিনিট সময় নেব। একটা রাস্তায় দুই মিনিটের জন্যে যাব। আপনার কি অসুবিধা আছে জগলু ভাই?

জগলু ভাই জবাব দিলেন না। আরেকটা সিগারেট ধরালেন।



চার.

জগলু ভাই আমার পেছনে পেছনে আসছেন। কালো চশমায় তাঁকে অন্ধ রবীন্দ্র সংগীত শিল্পীর মত লাগছে। তবে এই রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী অস্থির প্রকৃতির। সারাক্ষণই এদিক-ওদিক দেখছেন। খুট করে সামান্য কোনো শব্দ হল— সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে তাকালেন। এই অবস্থা। একটু পরপর আকাশের দিকেও তাকাচ্ছেন। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। আমাদের রিকশা নেয়া উচিত ছিল। জগলু ভাই রিকশা নেবেন না। যে গাড়িতে করে এসেছেন সেই গাড়িও গলির ভেতর ঢুকাবেন না। তাঁর নাকি সমস্যা আছে।

কলাবাগানের গলিতে যখন ঢুকছি তখন পটকা-ফাটা কিংবা রিকশার টায়ার-ফাটা শব্দ হল। জগলু ভাই লাফিয়ে উঠলেন। বডিগার্ড ধরনের যে দুজন তার সঙ্গে ছিল তারা এখনও আছে। বডিগার্ড দুজনের একজন বোকা টাইপ চেহারার। সে মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটে। কোন কিছুতেই বিচলিত হয় না। আরেকজন জগলু ভাইয়ের চেয়েও অস্থির। সে কিছুক্ষণ পরপর দাঁড়িয়ে পড়ে এবং পেছন দিকে তাকায়। তার মনে হয় ঘাম রোগ আছে। কপাল বেয়ে ঘাম পড়ছেই। যখন সে দাঁড়িয়ে যায় তখন রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে।

জগলু ভাই বললেন, তুমি কার বাসায় যাচ্ছ?

আমি বললাম, শুভ্রর বাসায় যাচ্ছি।

শুভ্র কে?

আমার অতি ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু। তার সঙ্গে দুই মিনিট কথা বলব।

আপনি ইচ্ছা করলে বাড়ির সামনে দাঁড়াতে পারেন। কিংবা আমার সঙ্গে বাড়িতে ঢুকতেও পারেন।

আমি বাইরে দাঁড়াব। তুমি দুই মিনিটের বেশি এক সেকেন্ড দেরী করবে না। তোমার বন্ধুর সঙ্গে আজ দেখা না করলে হয় না।

খুবই জরুরি দরকার। সে আমাকে একটা ধাঁধা দিয়েছিল। ধাঁধার উত্তর বের করেছি। তাকে সেটা জানানো দরকার।

কী ধাঁধা?

এমন কি বস্তু যার জীবন আছে কিন্তু সে খাদ্য গ্রহণ করে না! যে সন্তান জন্ম দেয় কিন্তু সন্তানকে চোখে দেখে না!

এমন কিছু কি আছে?

অবশ্যই আছে।

সেটা কী?

চিন্তা করে বের করুন এটা কি!

আবার বলো তো—

এমন কি বস্তু যার জীবন আছে কিন্তু সে খাদ্য গ্রহণ করে না! যে সন্তান জন্ম দেয় কিন্তু সন্তানকে চোখে দেখে না!

ভাল যন্ত্রণা তো! জটিল ধাঁধা।

জটিল ধাঁধার উত্তর সহজ হয়। আপনি সহজভাবে চিন্তা করুন। জটিলভাবে করবেন না।

বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে। বড় বড় ফোঁটা। লক্ষণ ভাল না। ঝুম বৃষ্টির পূর্বাভাস। শুভ্রদের বাড়ির গেট পর্যন্ত আসতেই ঝুম বর্ষণ শুরু হল। আমি জগলু ভাইকে নিয়েই বাড়িতে ঢুকলাম। বাড়ি বলা ঠিক হয় না। টিনের ছাউনি। ছাউনির ভেতর সিমেন্টের বস্তা, রড রাখা। তার ফাঁকে বড় চৌকি পাতা। চৌকির উপর বসে যে লেখাপড়া করছে তার নামই শুভ্র।

শুভ্রর বয়স দশ। রাজপুত্রদের চেহারার যে বর্ণনা পাওয়া যায়— সে রকমই তার চেহারা। বড় বড় চোখ। চোখে বুদ্ধি ঝলমল করছে। শুভ্রর বাবা জায়গাটার কেয়ারটেকার। এখানে যে বহুতলা ফ্ল্যাটবাড়ি হবে তিনিই সেটা দেখাশোনা করছেন। জগলু ভাই বললেন, এই ছেলে কে?

আমি বললাম শুভ্র। আমার বন্ধু। এই পৃথিবীর দশজন সেরা বুদ্ধিমান বালকদের একজন।

কার ছেলে?

যার ছেলে তার নাম নেয়ামত। এই পৃথিবীর দশজন সৎ মানুষদের তিনি একজন।

এর সঙ্গে পরিচয় হল কিভাবে?

আপনার সঙ্গে যেভাবে পরিচয় হয়েছে নেয়ামত ভাইয়ের সঙ্গেও একইভাবে পরিচয় হয়েছে। হঠাৎ দেখা। হঠাৎ পরিচয়।

জগলু ভাই চোখ থেকে চশমা খুলেছেন। তাঁর দৃষ্টি শুভ্রর দিকে। সেই দৃষ্টিতে আগ্রহ এবং কৌতূহল। আমি বললাম, এই তোর বাবা কই?

শুভ্র আমার দিকে না তাকিয়ে বলল, চিটাগাং।

যতবারই শুভ্রকে দেখতে এসেছি ততবারই সে প্রথম কিছুক্ষণ এমন ভাব করেছে যে আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। কথা বলে অন্য দিকে তাকিয়ে। কথা বলার ভঙ্গিটা— অপরিচিত কারো সঙ্গে কথা বলছে।

চিটাগাং কবে গিয়েছে?

গতকাল।

তোকে ফেলে রেখে চলে গেছে?

শুভ্র জবাব দিল না।

রাতে এখানে একা ছিলি?

হুঁ।

ভয় পেয়েছিলি?

হুঁ।

আজ রাতেও একা থাকবি?

হুঁ।

ভয় পাবি না?

পাব।

মাঝে মাঝে ভয় পাওয়া ভাল। ভয় পেলে শরীরের সব যন্ত্রপাতি ঝাকুনির মত খায়। শরীর ভাল থাকে। যারা সব সময় ভয়ের মধ্যে থাকে তাদের শরীর ভাল থাকে।

এই বলে আমি জগলু ভাইয়ের দিকে তাকালাম। জগলু ভাই বললেন, একটা বাচ্চা ছেলেকে একা রেখে বাবা চিটাগাং চলে গেছে এটা কেমন কথা?

আমি বললাম, বাবু নামের আরেকটা ছেলেকে ফেলে রেখে বাবা সারা ঢাকা শহর ঘুরছে কিন্তু ছেলেটার সঙ্গে দেখা করছে না; এটাই বা কেমন কথা?

বাবুর অবস্থার সঙ্গে এই ছেলের অবস্থা মেলাবে না। বাবুর সঙ্গে অনেকেই আছে। But this boy is all by himself.

শুভ্র এখন স্বাভাবিক হয়েছে। আমার দিকে তাকিয়েছে। মিটমিট করে হাসছে। আমি বললাম, তোর বাপ তোকে ফেলে চলে গেল কেন? তোকে নিয়ে গেল না কেন?

শুভ্র বলল, বাবা যদি বাসে করে কিংবা ট্রেনে করে যেত তাহলে তো আমাকে নিয়েই যেত। বাবা গেছে বড় স্যারের সঙ্গে বিমানে। সেখানে আমাকে কিভাবে নেবে। বাবা কি বড় স্যারকে বলবে— আমার ছেলেটাকে সঙ্গে নেই?

আমি বললাম, তা ঠিক।

শুভ্র বলল, হিমু চাচু তুমি কি কখনো বিমানে চড়েছ?

আমি বললাম, না। আমি উড়াউড়ির মধ্যে নাই।

শুভ্র জগলু ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, চাচু আপনি কখনো বিমানে চড়েছেন?

জগলু ভাই শুভ্রের প্রশ্নে হঠাৎ কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেলেন। হয়ত তিনি ভাবতেই পারেন নি এত আন্তরিক ভঙ্গিতে অপরিচিত একটা ছেলে তাকে প্রশ্ন করবে। তিনি থতমত খেয়ে বললেন, তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছ?

শুভ্র বলল, জ্বি।

জগলু বলল, আমি অনেকবার চড়েছি।

চাচু আপনি ভয় পান নি।

প্রথমবার যখন চড়েছি তখন খুবই ভয় পেয়েছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল আমার স্ত্রী রেনু...

জগলু ভাইয়ের কথার মাঝখানে শুভ্র বলল, চাচু আপনি চোখ থেকে সানগ্লাস খুলেন। আমি আপনার চোখ দেখতে পারছি না।

জগলু ভাই সানগ্লাস খুললেন। শুভ্রের পাশে চৌকিতে এসে বসলেন। তাঁর ভাব-ভঙ্গিতেই বুঝছি তিনি দীর্ঘ গল্প শুরু করবেন। আমি বললাম, জগলু ভাই আমাদের একটা কাজ ছিল না? স্যুটকেস উদ্ধার করা?

আরেক দিন উদ্ধার হবে।

আপনি কতক্ষণ থাকবেন এখানে?

থাকব কিছুক্ষণ।

আমার একটা কাজ ছিল যে।

কাজ থাকলে চলে যাও। তোমাকে তো আমি শিকল দিয়ে বেঁধে রাখি নি।

তাহলে একটা সিগারেট দিন। সিগারেট টানতে টানতে চলে যাই।

জগলু ভাই বললেন, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির মধ্যে সিগারেট টানতে পারবে না। এখানে সিগারেট শেষ করে তারপর যাও।

আমি সিগারেট ধরালাম। জগলু ভাই গল্প শুরু করলেন। শুভ্র চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। জগলু ভাই হাত নেড়ে গল্প শুরু করেছেন— জমাটি গল্প— আমি তখন থার্ড ইয়ার অনার্সের ছাত্র— চারমাস পরে ফাইনাল পরীক্ষা। এর মধ্যে বিয়ে করে— বিরাট ঝামেলায় পড়েছি।

শুভ্র বলল, ঝামেলায় পড়েছেন কেন?

মেয়ের বাবা-মাকে কিছু না জানিয়ে বিয়ে। তারা আমার নামে একটা মামলাও করে দিয়েছেন। আমি না-কি জোর-জবরদস্তি করে তাদের মেয়েকে আটকে রেখেছি। পুলিশ আমাকে খুঁজছে। আমি তখন ঠিক করলাম...

শুভ্র কথার মাঝখানে আবার প্রশ্ন করল, চাচু গল্প শুরু করার আগে বলুন পুলিশ কি শেষ পর্যন্ত আপনাকে ধরতে পেরেছিল।

হুঁ। কক্সবাজারে এক হোটেলে ধরে। আমাকে এবং তোমার চাচীকে।

কী ভয়ংকর!

ভয়ংকর তো বটেই। থানা-পুলিশ-হাজত। আমাকে কোর্টে চালান করে দিল। সেখানে আরেক নাটক। তোমার চাচী বাবা-মা আত্মীয়-স্বজনের

চাপে পড়ে বলে বসল, এই লোককে আমি চিনি না। সে আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। তোমার চাচীর কথা শুনে আমি অজ্ঞান হয়ে কাঠগড়ায় পড়ে গেলাম।

শুভ্র বলল, চাচা আমি এই গল্পটা আগে শুনব।

জগলু ভাই বললেন, ঠিক আছে— 'এইটাই আগে।' বলেই তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? চলে যাও। তোমার সঙ্গে রাতে কথা হবে।

গভীর রাতে জগলু ভাই টেলিফোন করলেন। আমি তখন নিজের বিছানায় শোবার আয়োজন করছি। বৃষ্টি চলছেই। সন্ধ্যার দিকে একটু থেমেছিল— সন্ধ্যার পর থেকে প্রবল বর্ষণ এবং দমকা বাতাস। ঢাকা শহরে ইলেকট্রিসিটিও নেই। মেইন ইলেকট্রিক গ্রীড নাকি ফেল করেছে।

গাঢ় অন্ধকারে চাদরের নিচ থেকে টেলিফোনে কথা বলার ভাল মজা আছে। আমি জগলু ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে মজা পাচ্ছি।

হ্যালো হিমু!

ইয়েস জগলু ভাই। আপনি কোথায়?

আমি শুভ্রের বাসায়।

বলেন কি? আটকা পরে গেছেন।

আটকা পরার তো কিছু নাই। এমন ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে একটা বাচ্চা ছেলেকে এটা ফেলে রেখে আমি যাই কিভাবে?

সেটাও কথা। রাতে কি এখানেই থাকবেন?

এ ছাড়া আমার কি অন্য কোনো বিকল্প আছে? ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। ইলেকট্রিসিটি নেই। বাচ্চা একটা ছেলে।

আপনাদের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ হয়েছে। নিজেরাই রাঁধলাম। ডিম ছিল, ডাল ছিল। ডিম, ডাল, চাল মিশিয়ে খিচুরি টাইপ একটা বস্তু তৈরী করেছি। খেতে ভাল হয়েছে।

আপনি রাঁধলেন।

হ্যাঁ আমি। শুভ্র ছিল আমার এসিস্টেন্ট।

শুভ্র কি জেগে আছে, না ঘুমুচ্ছে?

ঘুমাচ্ছে। মজার একটা কথা শোন হিমু যেই আমি ছেলেটাকে বললাম, এত রাতে তোমাকে একা ফেলে আমি যাব না ওম্নি সে কি করল যান? ঝাঁপ দিয়ে আমার গায়ে এসে পড়ল। আমি প্রস্তুত ছিলাম না। হুঁড়মুড় করে চৌকি থেকে নিচে পড়ে গেলাম। হা হা হা।



পাঁচ.

জগলু ভাইয়ের ছেলে বাবু ও আমি মুখোমুখি বসে আছি। ছেলেটির বয়স চার কিংবা পাঁচ। বড় বড় চোখ। কোনো কথা বলার আগে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। গরমের মধ্যেও তাকে ফুলহাতা শার্ট পরানো হয়েছে। সে খাটের মাথার দিকে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছে। তার হাতে লম্বা-লেজের একটা খেলনা বাঁদর। বাঁদরটার চোখও তার মতোই বড় বড়। আমি তাকিয়ে আছি বাঁদরটার দিকে। একসময় ভয়ে ভয়ে বললাম, তোমার এই বাঁদরটা কি কামড়ায়?

বাবু অবাক হয়ে বলল, কামড়াবে কেন? এটা তো খেলনা বাঁদর। ভেতরে তুলা ভরা।

আমি তার মতোই অবাক হয়ে বললাম, সত্যি খেলনা?

বাবু বলল, হ্যাঁ। হাতে নিয়ে দেখুন।

আমি বললাম, কোনো দরকার নেই, তুমি হাতে নিয়ে বসে থাকো। বাঁদরের কামড় খাওয়ার আমার কোনো শখ নেই।

আপনাকে বললাম না, এটা খেলনা!

খেলনা হলে ভালো কথা। তুমি কি কিছুক্ষণ এই জন্তুটাকে চাদর দিয়ে ঢেকে রাখবে?

আপনার ভয় লাগছে?

হুঁ।

আপনি ভীতু?

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম, বাবা রে, আমি ভীতু না, কিন্তু জন্তু-

জানোয়ার আমি পছন্দ করি না। তুমি দয়া করে এটাকে চাদরের নিচে ঢোকাও।

পৃথিবীর সব শিশু বয়স্ক ভীতু মানুষ দেখতে পছন্দ করে। বাবুও পছন্দ করল। সে তার খেলনা বাঁদর চাদরের নিচে লুকিয়ে ফেলল। আমি বললাম, লেজটা বের হয়ে আছে। লেজটাও ঢোকাও।

বাবু চাদরের নিচে লেজ ঢুকাতে ঢুকাতে আনন্দিত গলায় বলল, আপনি এত ভীতু!

আমি বললাম, পৃথিবীতে সাহসী মানুষ যেমন থাকে, ভীতু মানুষও থাকে। বুঝেছ?

বাবু হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। তার চোখে আনন্দ ঝলমল করছে। আমি বললাম, তুমি কি আমাকে চিনেছ?

না।

সেকী! তোমার সঙ্গে আমার অনেকবার টেলিফোনে কথা হয়েছে। আমি তোমার হিমু চাচা।

এখন চিনেছি। বাবা কোথায়?

তোমার বাবা কোথায় তা তো জানি না। তোমার বাবা আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিল একটা ভূতের বাচ্চা যোগাড় করার। বাচ্চা যোগাড় হয়েছে। ছেলে-বাচ্চা পাওয়া যায়নি। মেয়ে- বাচ্চা।

কোথায়?

সঙ্গেই আছে। চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছি। এরা আলো সহ্য করতে পারে না।

আমার কাছে দিন তো!

এখন দেওয়া যাবে না। তোমার জন্মদিনে তোমার বাবা তোমার হাতে দেবেন। আমি শুধু স্যাম্পল দেখাতে এনেছি। তোমার পছন্দ হয় কি না, জানা দরকার। তুমি চেয়েছিলে ছেলে-ভূতের বাচ্চা। এটা মেয়ে।

কই, একটু দেখান না!

জানালা বন্ধ করতে হবে। এত আলোতে বের করা যাবে না। কাউকে বলো দরজা-জানালা বন্ধ করতে।

বাবু চিৎকার করে ডাকল, ফুপু। বড় ফুপু।

মধ্যবয়স্ক এক মহিলা ঢুকলেন। চোখভরতি সন্দেহ নিয়ে আমার দিকে

তাকিয়ে রইলেন। আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, জগলু ভাই আমাকে পাঠিয়েছেন।

আমার কথায় ভদ্রমহিলার চোখের সন্দেহ দূর হলো না। তিনি শীতল গলায় বললেন, আপনি এই ঘরে ঢুকলেন কীভাবে?

আমি বললাম, দরজা খোলা ছিল, ঢুকে পড়েছি।

দরজা তো কখনো খোলা থাকে না।

আজ ছিল। ছিল বলেই তো ঢুকেছি। আপনি কি দয়া করে এই ঘরের জানালাগুলো একটু বন্ধ করবেন?

কেন?

বাবুর জন্য একটা উপহার এনেছি। তাকে দেব। উপহারটা এমন যে আলোতে দেখানো যায় না।

কী উপহার?

একটা ভূতের বাচ্চা।

ভদ্রমহিলার চোখের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হলো। তিনি তাকালেন বাবুর দিকে। বাবু বলল, উনাকে ছেলে-ভূতের বাচ্চা আনতে বলেছিলাম, উনি এনেছেন মেয়ে-ভূতের বাচ্চা।

ভদ্রমহিলা বললেন, কী এনেছেন দেখান।

আমি বললাম, দেখান বললেই তো আর দেখানো যায় না। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করতে হবে। তা ছাড়া আপনার সামনে আমি এই জিনিস বেরও করব না। ভূতের বাচ্চারা ভীতু প্রকৃতির হয়। আপনাকে দেখে ভয় পেতে পারে।

বাবু বলল, ফুপু, তুমি দরজা-জানালা বন্ধ করে চলে যাও তো!

আমি হাসিমুখে বললাম, ভূতের বাচ্চা তো এই বাড়িতেই থাকবে। বাবু যদি পরে আপনাকে দেখাতে চায়, আপনি দেখবেন। আপনাকে এই মুহূর্তেই যে দেখতে হবে তা তো না।

চাদরের আড়াল থেকে আমি সবুজ রঙের চ্যাপটা একটা বোতল বের করলাম। বোতলের মুখ সিলগালা দিয়ে বন্ধ করা। বোতলের ভেতর দুটি মারবেল। ভালো করে তাকালে ধোঁয়াটে কিছু একটা দেখা যায়। আমি বললাম, ধোঁয়া-ধোঁয়া জিনিসটি ভূত। কাচের গোল জিনিস দুটি চেন?

না।

এদের বলে মারবেল। ভূতের বাচ্চাটা যেন খেলতে পারে, এইজন্য মারবেল দিয়ে দেওয়া।

ওর নাম কী?

নাম জানি না, তুমি জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়ো।

কথা বলে?

ছোটদের সঙ্গে বলে। বড়দের সঙ্গে বলে না।

কী খায়?

এখন চাঁদের আলো খায়। আরেকটু বড় হলে মোমবাতির আলো, কুপির আলো, হারিকেনের আলো এইসব খাবে।

কীভাবে খায়?

বোতলটা চাঁদের আলোতে কিছুক্ষণ রেখে দিলেই তার খাওয়া হয়ে যাবে।

এর মা-বাবা কোথায়?

কোথায় তা তো জানি না। তুমি জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়ো।

এখন জিজ্ঞেস করব?

এখন জিজ্ঞেস না করাই ভালো। আমি সামনে আছি তো, জবাব দেবে না। আমাকে পছন্দ করে না।

কেন পছন্দ করে না?

এটাকে আমি ধরে এনেছি তো, এইজন্যই আমাকে পছন্দ করে না। তোমাকে কেউ যদি ধরে নিয়ে ভূতদের কাছে দিয়ে আসত, তুমি তাকে পছন্দ করতে?

না।

এখন বোতলটা দাও, আমি এটা নিয়ে চলে যাই।

না, আমি বোতল দেব না।

তুমি ছেলে-ভূত চেয়েছিলে, এটা তো মেয়ে...।

বাবু গম্ভীর গলায় বলল, আমি বোতল দেব না।

সে বোতল চাদরের নিচে লুকিয়ে ফেলল। বাবু সম্পর্কে যেসব তথ্য জানলাম তা হলো, বাবুর মা মারা গেছে তার এক বছর বয়সে। বাবুর দুই ফুপু তাকে পালাক্রমে লালনপালন করেন। এখন দায়িত্বে আছেন বড় ফুপু,

যাঁর নাম রোখসানা। বাবুর অসুখ ধরা পড়েছে তিন বছর বয়সে। এই অসুখে রক্তের লোহিত কণিকা তৈরি কমে যায়। যেগুলো তৈরি হয় সেগুলো থাকে ভাঙা-ভাঙা। অসুখের একটাই চিকিৎসা বোনম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট। সেই চিকিৎসা এক দফা করা হয়েছে। কাজ হয়নি। দ্বিতীয় দফা চিকিৎসার প্রস্তুতি চলছে। সেটা কখন শুরু হবে কেউ জানে না। বাবুর সঙ্গে তার বাবার দেখা হয় না বললেই চলে। গত ছয় মাসে পিতা-পুত্রের কোনো দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। ছেলেটা তার বাবার জন্য সবসময় অপেক্ষা করে থাকে। তার খাটের এক পাশে সে বাবার জন্য দুটো বালিশ দিয়ে রাখে। তার ধারণা, কোনো-এক রাতে ঘুম ভেঙে সে দেখবে, বাবা তার পাশে শুয়ে আছে।

বাবুকে দেখে চলে আসার সময় তার ফুপু রোখসানা বেগমের সঙ্গে কথা হলো। অতি শীতল ধরনের মহিলা। কথাবার্তা কাটা-কাটা। তিনি ধরে নিয়েছেন, আমি আঙুল-কাটা জগলুর দলের একজন। আমার চাদর ঝাড়া দিলে পাঁচ-ছয়টা কাটা আঙুল পাওয়া যাবে। তিনি কঠিন গলায় বললেন, আপনার ওস্তাদের খবর কী?

আমি বললাম, ভালো।

আপনার ওস্তাদের ডানহাত মতি মিয়া ধরা পড়েছে। এই বাড়িতে বাবুকে দেখতে এসে ধরা পড়েছে।

আমি বললাম, ওস্তাদের কাছ থেকে এই খবর পেয়েছি।

আপনিও এখান থেকে ধরা খাবেন। পুলিশ আপনাকে ধরবে।

আমি হাসিমুখে বললাম, ধরবে না। পুলিশ ধরাধরি কাজ দিনে করে না। রাতে করে। সকাল আটটায় কোনো অপরাধী পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে, এমন রেকর্ড নাই। এই সময় পুলিশ ভাইরা চা-নাশতা খায়।

আপনি কি আপনার ওস্তাদকে একটা কথা বলতে পারবেন?

পারব।

তাকে বলবেন, সে যেন তার ছেলের দায়িত্ব অন্য কাউকে দেয়। আমি আর আমার বোন এই দায়িত্ব নেব না। পুলিশ যে আমাদেরকে কী পরিমাণ যন্ত্রণা করে তা আপনার ওস্তাদ জানে না।

আমি ওস্তাদকে বলব।

আজকের খবরের কাগজ পড়েছেন?

আমি খবরের কাগজ পড়ি না।

আজকেরটা পড়ে দেখতে পারেন। ভালো লাগার সম্ভাবনা আছে। বাসায় খবরের কাগজ আছে। এনে দেব?

দিতে পারেন।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খবর পড়ে শেষ করলাম। প্রথম পাতায় সচিত্র খবর।

আঙুল-কাটা জগলু গ্রুপের সদস্য কুখ্যাত সন্ত্রাসী মতি মিয়া ক্রসফায়ারে নিহত। পুলিশ তাকে নিয়ে অস্ত্রউদ্ধার অভিযানে বের হয়েছিল। এই সময় তার সঙ্গীসাথিরা গুলি ছুড়তে শুরু করে। সুযোগ বুঝে মতি মিয়া পুলিশের গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলে দুই দলের ক্রসফায়ারে নিহত হয়। তার লাশ গত দুদিন ধরে হাসপাতালের মর্গে পড়ে আছে। তার আত্মীয়স্বজনরা কেউ লাশ নিতে আসেনি। মতি মিয়ার মৃত্যুর সংবাদে চানখাঁরপুল এলাকার অধিবাসীরা মিষ্টি বিতরণ করে।

রোখসানা বেগম বললেন, খবর পড়েছেন?

জি।

আপনাদের সবার ক্ষেত্রে এই ব্যাপার ঘটবে। ডেডবডি মর্গে পড়ে থাকবে, কেউ আনতে যাবে না। আপনার ওস্তাদের ডেডবডিও আমরা কেউ আনতে যাব না। এই খবরটা কি আপনি আপনার ওস্তাদকে দিতে পারবেন?

পারব। আপা যাই?

আপা ডাকবেন না। আমি আপনাদের কারোর আপা না।

মতি মিয়ার ডেডবডি হাসপাতালের মর্গ থেকে রিলিজ করা খুব ঝামেলার ব্যাপার হবে বলে ভেবেছিলাম। বাস্তবে কোনো ঝামেলাই হলো না। দুটা ফরম ফিলআপ করলাম। তিন জায়গায় দস্তখত করলাম। যিনি ফরম ফিলআপ করালেন, তিনি একবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কী হয়?

আমি বললাম, ভাই।

ভদ্রলোক চোখ সরু করে বললেন, আপনি কী করেন?

প্রশ্নের উত্তরে আমি মিষ্টি করে হাসলাম। তাতেই ভদ্রলোকের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, লাশ নিবেন কীভাবে?

আমি বললাম, ঠেলাগাড়ি।

ভদ্রলোক এমনভাবে মাথা নাড়লেন, যেন ঠেলাগাড়িতে লাশ নেওয়াটাই উত্তম ব্যবস্থা।

ঠেলাগাড়িটা এখন মনসুর সাহেবের বাড়ির সামনে। আমি মনসুর সাহেবের ড্রইংরুমে বসে কফি খাচ্ছি। আমি এসেছি সুটকেস ডেলিভারি নিতে। আজ মঙ্গলবার, পিতা-কন্যা দুজনেরই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা। মাল আজকের মধ্যেই ডেলিভারি না নিলে সমস্যা হবে। জগলু ভাই ব্যাপারটা সহজভাবে নেবেন না।

সুটকেস ডেলিভারি পেয়ে গেছি। পিতা-কন্যার কাছে বিদায় নেওয়া হয়েছে। কন্যা আজ আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে। কেক খেতে দিয়েছে। কফি খেতে দিয়েছে। ভালো জায়গার কেক। কেক থেকে ভেসে-আসা মাখনের গন্ধ এখনো বাতাসে ভাসছে।

মনসুর সাহেব বললেন, আমি তোমাকে বলেছিলাম মাসের এক তারিখে এসে আমার ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে দশ হাজার টাকা নিয়ে যাবে। তুমি তো আসনি।

আমি হাসিমুখে বললাম, স্যার, সময় পাইনি। বেকার মানুষের ব্যস্ততা থাকে বেশি।

মনসুর সাহেব কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এই সময় তাঁর দারোয়ান এসে কানে-কানে কী যেন বলল, মনসুর সাহেবের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি আবার কানে-কানে তাঁর মেয়েকে কী যেন বললেন। মেয়ের মুখও ছাইবর্ণ হয়ে গেল। আমি বললাম, কোনো সমস্যা?

মনসুর সাহেব কিছু বললেন না, মিতু বলল, আমাদের বাসার সামনে যে ঠেলাগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, সেটা কি আপনি নিয়ে এসেছেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

মিতু বলল, ঠেলাগাড়িতে বিছানার চাদর দিয়ে ঢাকা জিনিসটা কী?

আমি বললাম, একটা ডেডবডি। জগলু ভাইয়ের আপন লোক মতি মিয়ার ডেডবডি। স্যার, মতি মিয়াকে চিনেছেন নিশ্চয়ই।

মনসুর সাহেব থেমে থেমে বললেন, তুমি তার ডেডবডি নিয়ে কী করছ?

কবর দিতে নিয়ে যাচ্ছি স্যার। হাসপাতালের মর্গ থেকে রিলিজ করে এনেছি। এখন গোরস্তানে নিয়ে যাব।

মিতু বলল, বাড়ির সামনে একটা ডেডবডি রেখে আপনি চা-কেক খাচ্ছেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ। জীবিত মানুষই চা-কেক খাবে। মৃত মানুষও যদি চা-কেক খেতে পারত, তা হলে মতি ভাইকেও ডেকে আনতাম।

দারোয়ান এখনো আছে। সে এমনভাবে তাকিয়ে আছে, যেন হুকুমের অপেক্ষা করছে। বড়সাহেবের হুকুম পাবে আর সে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে আমার ওপর। আমি দারোয়ানের দিকে তাকিয়ে বললাম, দারোয়ান ভাই! আপনি ঠেলাগাড়ির আশপাশে থাকলে ভালো হয়। কুকুর ডেডবডি অ্যাটাক করতে পারে।

দারোয়ান তাকাল তার বড়সাহেবের দিকে। সেই দৃষ্টিতে পরিষ্কার লেখা—আপনি অনুমতি দেন, আর চুপ করে দেখেন আমি কী করি।

বড়সাহেব তেমন কোনো হুকুম দিলেন না। চোখে ইশারা করলেন চলে যেতে। ঘরে আমরা এখন তিনজন। নীরবতা চলছে। কেউ মনে হয় বলার মতো কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছে না। আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, স্যার চলি।

মনসুর সাহেব আমাকেও বসতে ইশারা করলেন। আমি ধপ করে বসে পড়লাম। মিতু অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকাচ্ছে। সম্ভবত বোঝার চেষ্টা করছে, কেন তার বাবা আমাকে বসতে বলল। মিতু কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, তখনই আমার মোবাইল বাজল। আমি বোতাম টেপার আগেই বুঝতে পারলাম টেলিফোন করেছেন জগলু ভাই। আমি লক্ষ করেছি, বেশির ভাগ সময়ই রিং শুনে বোঝা যায় টেলিফোন কে করেছে। ব্যাপারটা কী কে জানে!

হিমু?

জি, জগলু ভাই! ভালো আছেন?

তুমি কোথায়?

মনসুর সাহেবের বাসায়। মাল ডেলিভারি নিতে এসেছি।

পেয়েছ?

জি, পেয়েছি।

দশ মিনিটের মধ্যে চলে আসো।

কোথায় চলে আসব?

রমনা পার্কে। ওইদিন যেখানে বসেছিলে সেখানে। আমার লোক থাকবে।

জগলু ভাই! একটু যে দেরি হবে! চার ঘণ্টা ধরে রাখেন। তার বেশিও লাগতে পারে।

কেন দেরি হবে?

আমার সঙ্গে আছে মতি মিয়ার ডেডবডি। হাসপাতাল থেকে রিলিজ করিয়েছি। দাফন-কাফনের সময় লাগবে। এখান থেকে আজিমপুর গোরস্তানে যেতেই লাগবে দুই ঘণ্টা। ঠেলাগাড়িতে করে যাওয়া, বুঝতেই পারেন।

তোমার সঙ্গে মতি মিয়ার ডেডবডি?

জি।

সত্যি কথা বলছ?

জি।

জগলু ভাই চুপ করে আছেন। ঘটনা হজম করতে সময় লাগছে। সময় লাগার কথা।

হিমু!

জি ওস্তাদ?

মতি সব সময় বলত, মারা গেলে তার ডেডবডি যেন গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তার বাবার পাশে যেন তার কবর হয়। তার বাড়ি নেত্রকোনা জেলা, থানার নাম কেন্দুয়া, গ্রাম রোয়াইলবাড়ি। একটা মাইক্রোবাসে করে ডেডবডি নিয়ে যাও। পারবে না?

অবশ্যই পারব। আপনারা কেউ যাবেন?

না।

মাইক্রোবাসের ভাড়া কোত্থেকে দেব?

সুটকেসের টাকা নিয়ে খরচ করো।

ওই টাকাটা ভাঙতে ইচ্ছা করছে না। আপনি বরং একটা কাজ করুন,

মনসুর সাহেবকে বলুন, তিনি যেন তাঁর একটা গাড়ি দেন। উনি আমার সামনেই আছেন। নিন কথা বলুন।

আমি হতভম্ব মনসুর সাহেবের হাতে টেলিফোন ধরিয়ে দিয়ে মিতুর দিকে তাকিয়ে মধুর ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে বললাম, আরেক কাপ কফি খাওয়াবে? ঘরের কফি এবং চটপটি কখনো দোকানের মতো হয় না। তোমাদের কফি দোকানের চেয়েও ভালো।

মিতু অগ্নিদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মনসুর সাহেবও তাকিয়ে আছেন। ওনার সঙ্গে জগলু ভাইয়ের কী কথা হয়েছে জানি না। তবে মনসুর সাহেবের দৃষ্টিতে কোনো উত্তাপ নেই। মনসুর সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, হিমু শোনো। ডেডবডি ক্যারি করার মতো গাড়ি আমার কাছে নেই। তবে আমি গাড়ি ভাড়া করে দিচ্ছি। আরেকটা কথা, তোমার অসুবিধা না হলে আমিও তোমার সঙ্গে যেতে চাই।

মিতু প্রায় চেঁচিয়ে বলল, কেন?

মনসুর সাহেব বললেন, আমি জানি না কেন যেতে চাচ্ছি। কিন্তু যেতে যে চাচ্ছি এতে ভুল নেই।

বাবা, আমাদের ফ্লাইট বিকাল তিনটায়।

মনসুর সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, ফ্লাইট ক্যানসেল করা কোনো ব্যাপার না।

দুটি গাড়ি নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে। গন্তব্য নেত্রকোনো, থানা কেন্দুয়া, গ্রাম রোয়াইলবাড়ি। প্রথম গাড়িতে (বিশাল পাজেরো টাইপ গাড়ি) আছেন মনসুর সাহেব এবং তাঁর কন্যা মিতু। তাঁদের পেছনে পেছনে মাইক্রোবাসে করে আমি। আমার সঙ্গে বাদল। বাদলকে খবর দিয়েছিলাম, সে মহাউৎসাহে ছুটে এসেছে। আমরা দুজন বসেছি ড্রাইভারের পাশে। ড্রাইভারে নাম নেয়ামত আলি। হাসিখুশি তরুণ। লাশের গাড়ির ড্রাইভার হবে বয়স্ক, বিষণ্নমুখের কেউ। নেয়ামত আলির মধ্যে বিষণ্নতার ছিটাফোঁটা নেই। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, সে বরযাত্রী নিয়ে যাচ্ছে। গাজীপুর চৌরাস্তা পার হওয়ার পরই সে বলল, স্যার, গান দিব?

আমি বললাম, কী গান দেবে?

সব ধরনের গান আছে—ইংলিশ, হিন্দি, ড্যান্স মিউজিক।

ড্যান্স মিউজিক দাও।
নেয়ামত আলি বলল, পতাকা নামায়ে মিউজিক দিতে হবে।
কী পতাকা?
লাল পতাকা। যে-গাড়িতে লাশ যায়, সেই গাড়িতে লাল পতাকা দিতে হয়। আমার গাড়িতেও আছে। মিনিস্টারের গাড়িতে যেমন পতাকা থাকে, লাশের গাড়িতেও থাকে। লাশ হইল গিয়া মিনিস্টার।
নেয়ামত রাস্তার পাশে গাড়ি পার্ক করে পতাকা খুলে ফেলে ড্যান্স মিউজিক দিয়ে দিল। ঝা ঝুমঝুম ঝা ঝুমঝুম মিউজিক। আমি বাদলের দিকে তাকিয়ে বললাম, কেমন বুঝছিস?
বাদল সবগুলি দাঁত বের করে বলল, খুবই ভালো।
মজা পাচ্ছিস তো?
অবশ্যই। তোমার সঙ্গে যে-যেনো জায়গায় যাওয়ার মধ্যেই মজা আছে।
খালুসাহেব কি জানেন, তুই আমার সঙ্গে?
না।
তাঁকে জানানো দরকার। রাতে-রাতে আমরা ফিরতে পারব বলে মনে হয় না। উনি পরে টেনশান করবেন।
বাদল উদাস গলায় বলল, জানাতে হলে তুমি জানাও। আমি কথা বলব না।
আমি খালুসাহেবকে টেলিফোন করলাম। খালুসাহেব টেলিফোন ধরেই বললেন, হিমু, বাদল কোথায়?
আমি বললাম, আমার পাশেই বসে আছে।
তোমার পাশে বসা?
জি, খালুসাহেব।
খালুসাহেব থমথমে গলায় বললেন, সে কেন তোমার পাশে বসে আছে, সেটা কি জানতে পারি?
আমি মধুর ভঙ্গিতে বললাম, আমরা একটা ডেডবডি নিয়ে নেত্রকোনার দিকে রওনা হয়েছি খালুসাহেব।
কী বললে, আবার বলো।
আমি আর বাদল একটা ডেডবডি নিয়ে নেত্রকোনা যাচ্ছি।

কী নিয়ে নেত্রকোনা যাচ্ছ?

ডেডবডি। পত্রিকায় পড়েছেন নিশ্চয়ই, কুখ্যাত সন্ত্রাসী মতি মিয়া ক্রসফায়ারে মারা গেছে। তার ডেডবডি নিয়ে যাত্রা করেছি। খালুসাহেব, আমাদের জন্য একটু দোয়া রাখবেন। আপনি কি বাদলের সঙ্গে কথা বলবেন?

খালু সাহেব স্পষ্ট স্বরে বললেন, 'না।' বলেই টেলিফোন অফ করে দিলেন।

আমরা রোয়াইলবাড়ি পৌঁছলাম সন্ধ্যাবেলা। পরিকল্পনা ছিল ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দাফন-কাফন শেষ করে ঢাকার দিকে রওনা হব। নানান ক্যাচাল শুরু হয়ে গেল। 'জাগ্রত জনতা' আমাদের ঘিরে ধরল। জাগ্রত জনতার মুখপাত্র জামে মসজিদের পেশ ইমাম মওলানা তাহেরউদ্দিন জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। তাঁর বক্তব্য, অতি দুষ্ট সন্ত্রাসীর কবর রোয়াইলবাড়িতে হবে না।

জাগ্রত জনতাকে কখনো কিছু বোঝানো যায় না। তাদেরকে কিছু বলা বৃথা। আমরা সেখান থেকে রওনা হলাম মতি মিয়ার মামার বাড়ি বাল্লা গ্রাম। এই গ্রাম যেহেতু অতি প্রত্যন্ত অঞ্চলে, সেখানে জাগ্রত জনতার দেখা পাবার কথা না।

দেখা গেল আমার অনুমান ভুল। বাল্লা গ্রামের জনতা আরো বেশি জাগ্রত। তাদের মূর্তি আরো উগ্র। বাল্লা গ্রামের জাগ্রত জনতার মুখপাত্র জনৈক হিন্দু মেম্বার। তাঁর নাম যাদব।

যাদববাবু চোখ-মুখ লাল করে বললেন, আপনাদের বিবেচনা দেখে 'অদ্ভুত' হয়েছি। এমন এক খুনিকে আমাদের গ্রামে নিয়ে এসেছেন!

আমি বললাম, এখন তো সে আর খুন করতে পারবে না। কবরে ঢুকায়ে দেবেন। শরীর পচে-গলে যাবে।

অসম্ভব! অসম্ভব! আপনারা যদি এক্ষণ বিদায় না হন, অসুবিধা আছে।

কী অসুবিধা?

সেটা মুখে বলব না। কাজে দেখবেন।

আমি জগলু ভাইকে টেলিফোন করলাম। জানতে চাইলাম কী করণীয়। জগলু ভাই শান্ত গলায় বললেন, লাশ ফেলে চলে আসো।

কোথায় ফেলে আসব?

যেখানে ইচ্ছা ফেলে আসো।

বলেই জগলু ভাই টেলিফোন অফ করে দিলেন। বাদল আমার দিকে তাকিয়ে হাসি- হাসি মুখে বলল, খুবই মজা লাগছে। গুড অ্যাডভেঞ্চার। ডেডবডি নিয়ে ঘুরছি। কবর দেয়ার জায়গা পাচ্ছি না। সো ইন্টারেস্টিং। সো মাচ ফান—

দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী আঙুল-কাটা জগলু ভাইয়ের ডানহাত মতি মিয়ার ডেডবডি নিয়ে আমরা মোটামুটি ভালো ঝামেলাতেই পড়ে গেলাম। রাত একটা থেকে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। এমন বৃষ্টি যে দুই হাত সামনে কী হচ্ছে দেখা যায় না। আমরা ঢাকার দিকে ফিরে আসছি। শেষ চেষ্টা হিসেবে আজিমপুর গোরস্তানে ট্রাই করব এরকম পরিকল্পনা।

নিশিরাতে সাধারণ শব্দও কানে অন্যরকম শোনায়। গাড়ির চাকার শব্দ, বাতাসের শব্দ এবং বৃষ্টির শব্দ—সব মিলেমিশে একাকার হয়ে কেমন ভৌতিক আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। মাঝেমধ্যেই মনে হচ্ছে সাদা চাদরে মুড়ি দেওয়া মতি মিয়া কাশছে। বুড়ো মানুষের খকখক কাশির মতো কাশি।

বাদল চমকে উঠে বলল, ভাইজান, কে কাশে?

মাইক্রোবাসের ড্রাইভার নিয়ামত আলি চাপাগলায় বলল, আয়াতুল কুরসি পড়েন। আইজ আমরার খবর আছে।

বাদল আমার কাছে ঘেঁষে এসে ফিসফিস করে বলল, মতি মিয়া কাশছে নাকি?

আমি উদাস গলায় বললাম, বুঝতে পারছি না। ঠাণ্ডা লেগে কাশিরোগ হতে পারে তবে লাশদের ঠাণ্ডা লাগে এ-রকম আগে শুনি নাই।

বাদল বলল, চলো, আমরা উনাদের পাজেরো গাড়িতে চলে যাই।

নিয়ামত আলি বলল, আপনেরা পাজেরো গাড়িতে যাইবেন আর আমি একলা থাকুম এইখানে? ভূতের থাপ্পড় একা খামু? মাফ চাই !

বলতে বলতে ব্রেক চেপে সে গাড়ি থামিয়ে দিল। মনসুর সাহেবের গাড়ি অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। সেটাও ফিরে এল। মনসুর সাহেব গাড়ির উইন্ডোগ্লাস নামিয়ে উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, কী হয়েছে?

আমাদের ড্রাইভার বলল, লাশ জিন্দা হয়ে গেছে। কাশতেছে।

মনসুর সাহেব বললেন, কি বল এইসব?

বাদল সঙ্গে সঙ্গে বলল, ঘটনা সত্য। একবার হাঁচি দিয়েছে, আমি স্পষ্ট শুনেছি।

নিয়ামত আলি বলল, সে ভূতে-পাওয়া লাশ নিয়ে যাবে না। লাশ এইখানে নামিয়ে দিতে হবে। লাশ নামানোর সময়ও সে হাত দিয়ে ধরবে না।

আমি মনসুর সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, স্যার, কী করা যায়?

উনি চুপ করে রইলেন। মিতু বলল, সব ঝামেলা আপনি তৈরি করেছেন। কী করা যায় সেটাও আপনি ঠিক করবেন।

আমি বললাম, তুমি আমার অবস্থায় হলে কী করতে?

মিতু বলল, আপনার অবস্থা আমার কখনো হতো না।

লাশ এখানে ফেলে রেখে যাব কি না, সেটা বলো।

আপনার যা ইচ্ছা করুন, আমি আর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করব ; তারপর বাবাকে নিয়ে চলে যাব।

নিয়ামত আলি বলল, বাহাসের সময় নাই। এই জিনিস রাস্তার ধারে ফেলায়া আমরা চইল্যা যাব। সোজা কথা। সোজা হিসাব।

মৃত মানুষের ওজন বাড়ে কথাটা সত্যি। হালকা-পাতলা মতি মিয়াকে নড়ানোই মুশকিল। টানাটানির কাজ আমাকেই করতে হচ্ছে। কেউ ধরবে না। বাদলও না। মনসুর সাহেব পাঁচ-ব্যাটারির একটা টর্চ জ্বালিয়ে ধরে আছেন।

নিয়ামত আলি শেষ কথা বলে দিয়েছে, তাকে এক লাখ টাকা দিলেও সে লাশ হাত দিয়ে ধরবে না। দুই লাখ দিলেও না।

অনেক ঝামেলা করে ডেডবডি নামালাম এবং কাদায় পা হড়কে গড়িয়ে পানিভরতি গর্তে পড়ে গেলাম। লাশের গা থেকে কাপড় খুলে গেছে। তার বীভৎস মুখ বের হয়ে আছে। লাশের চোখের পাতা রিগর মর্টিস হবার আগেই বন্ধ করতে হয়, নয়তো লাশ বিকট ভঙ্গিতে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। মতি মিয়ার চোখ কেউ বন্ধ করেনি বলে তার চোখ ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে।

তাকে নিয়ে পানিতে নামার পর একটা ঘটনা ঘটল। ডেডবডি পানিতে ভেসে উঠল। এমনভাবে ভাসল, যেন সে বসে আছে এবং আমাদের দিকে

তাকিয়ে মাথা নাড়ছে। চারদিকেই ঘন শালবন। বাতাস লেগে গাছের পাতায় শিসের মতো শব্দ হলো। সবার কাছে মনে হলো মাথা দোলাতে দোলাতে মতি মিয়া শিস দিচ্ছে।

মিতু আতঙ্কিত গলায় বলল, হিমু সাহেব, আপনি এখনো গর্তে বসে আছেন কেন? উঠে আসুন তো! আমি আপনার পায়ে পড়ি। প্লিজ উঠে আসুন।

আমি বললাম, উঠে আসতে পারছি না। ব্যাটা আমার শার্ট ধরে আছে।

মিতু বলল, এসব আপনি কী বলছেন?

আমি বললাম, ঠাট্টা করছি। মৃত মানুষ শার্ট ধরবে কীভাবে? নামার সময় তার আঙুলের ভেতর শার্ট ঢুকে গেছে।

নিয়ামত আলি বলল, আমি পরিষ্কার দেখছি ভাইজান উঠতে ধরছিল, লাশটা খপ কইরা উনার শার্ট ধরছে। আইজ আমরার খবর আছে। পড়েন সবাই, আয়াতুল কুরসি পড়েন।

মানুষের স্বভাব হচ্ছে, সে একবার ভয় পেলে ভয় পেতেই থাকে। ভয় পাওয়াটা তার জন্য ধারাবাহিক ব্যাপার হয়ে যায়। নিয়ামত গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে বলল, কেউ দয়া করে পেছনে তাকাবেন না। পিছনে তাকাইলে ধরা খাবেন।

বাদল ভীত গলায় বলল, কেন?

নিয়ামত আলি চাপাগলায় বলল, হারামজাদা এখন খাড়া হয়েছে।

বাদল বলল, কে খাড়া হয়েছে?

নিয়ামত ফিসফিস করে বলল, বুঝেন না কেন? মতি মিয়ার লাশ খাড়া হইছে। আয়াতুল কুরসি পড়েন। হারামজাদা মনে হয় গাড়ির পেছনে পেছনে দৌড় দিবে। দৌড় দিয়া আমাদের ধরতে পারলে খবর আছে।

গাড়ির দ্রুতগতিতে চলার অনেক বর্ণনা আছে। যেমন উল্কার গতিতে চলছে, গাড়ি ঝড়ের গতিতে চলছে। নিয়ামত বর্ণনার কাছাকাছি গতিতেই গাড়ি চালাচ্ছে। বিপজ্জনকভাবে সে মনসুর সাহেবের পাজেরোকে ওভারটেক করে এগিয়ে গিয়ে তৃপ্তির ভঙ্গিতে বলল, এখন ধরলে পাজেরোওয়ালারে ধরবে। আমরা রক্ষা পাইছি।

সে অবিশ্যি রক্ষা পেল না, পাজেরের ড্রাইভার তাকে ওভারটেক

করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিয়ামত আলি পাজেরো ওভারটেক করল। ঝড়ের গতি বাড়ছে। আমাদের দুই গাড়ির ওভারটেকের খেলা চলছে।

এর মধ্যে খালুসাহেবের টেলিফোন এসেছে। তিনি বাদলের সঙ্গে কথা বলতে চান। আমি বাদলের হাতে মোবাইল সেট ধরিয়ে দিলাম। বাদল ফিসফিস করে বলল, বাবা, এখন কথা বলতে পারব না। আমরা খুব বিপদে আছি। আমাদের তাড়া করছে?

কে তাড়া করছে?

মতি মিয়া। মতি মিয়া হচ্ছে ডেডবডি, যাকে আমরা কবর দিতে নিয়ে যাচ্ছিলাম। সে জীবিত হয়ে গেছে! সে আমাদের তাড়া করছে। ধমকাচ্ছ কেন বাবা? নাও, হিমু ভাইজানের সঙ্গে কথা বলো।

আমি মধুর গলায় বললাম, হ্যালো! খালুজান ভালো আছেন? খালার শরীর ভাল?

খালুজান আকাশ ফাটিয়ে গর্জন করলেন, তুমি আমার ছেলেকে কী করেছ?

কিছু করিনি তো খালুজান।

সে এইসব কী আবোল-তাবোল বলছে। মরা লাশ তাড়া করেছে।

মনে হয় চোখের ধান্দা। আমাদের ড্রাইভার নেয়ামতও সেরকম বলছে। আপনি কি ড্রাইভার নেয়ামতের সঙ্গে কথা বলবেন?

চুপ! স্টুপিড। তুমি শুধু ঢাকায় এসে উপস্থিত হও। দেখো, তোমাকে কী করি।

এত উত্তেজিত হবেন না খালুসাহেব। অতিরিক্ত উত্তেজনায় স্ট্রোক-ফ্রোক হয়ে যেতে পারে।

চুপ! স্টুপিড।

একই গালি বারবার কেন দিচ্ছেন খালুজান? অন্য কোনো গালি দেন। একই গালি বারবার দিলে গালির পাওয়ার কমে যায়।

খালুজান বললেন, তোমাদের এখানে তোমরা দুজন ছাড়া আর কে আছে?

নিয়ামত আলি আছে। আমাদের ড্রাইভার।

দেখি, তার হাতে টেলিফোনটা দাও।

আমি বললাম, খালুজান, তার হাতে টেলিফোন দেওয়া যাবে না। সে

যে-গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে, এখন যদি তার হাতে টেলিফোন দিই সে অ্যাক্সিডেন্ট করবে। আমি বরং তার কানের কাছে টেলিফোনটা ধরি, আপনার যা বলার বলেন।

আমি নিয়ামতের কানের কাছে টেলিফোন ধরলাম। নিয়ামত বলল, বিত্তান্ত সবই সত্য। আপনে মুরুব্বি, আপনের সঙ্গে মিথ্যা বইলা কোনো ফায়দা আছে? খামাখা ধমকাইতেছেন ক্যান? আমি ড্রাইভার নিয়ামত। আমি ধমকের ধার ধারি না। স্টুপিড গালি কইলাম দিবেন না। আমি জান হাতে নিয়া গাড়ি চালাইতাছি। আমি বইসা বইসা...' ছিঁড়তাছি না। বুঝছেন মুরুব্বি?

ঝড়ের গতি কমে এসেছে। আমরা ঢাকার কাছাকাছি চলে এসেছি। বাদলের ভয়টা মনে হয় কমেছে। সে আমার কাঁধে মাথা রেখে আরামে ঘুমুচ্ছে।



ছয়.

মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি। গন্ধটা পরিচিত কোনো ফুলের না, আবার অপরিচিতও না। গন্ধের উৎস ধরার চেষ্টা করছি। ধরতে পারছি না।

গন্ধের উৎস ধরে ফেলা জটিল কোনো কাজ না। চোখ মেললেই বোঝা যাবে ব্যাপারটা কী। চোখ মেলতে ইচ্ছা করছে না। আধো-ঘুম আধো-জাগরণ অবস্থার আলাদা মজা আছে। এ-অবস্থায় অনুমান-অনুমান খেলা খেলতে ভালো লাগে।

এখন বুঝতে পারছি ফুলের গন্ধের উৎস আমার বিছানার পাশের চেয়ার। সেই চেয়ারে কেউ-একজন বসে আছে। হাতে ফুল নিয়ে এসেছে। প্রসেস অব এলিমিনেশন পদ্ধতিতে কি বের করা যায়, কে?

আমার কাছে ফুল নিয়ে আসার মানুষ একজনই—রূপা। রূপা অবশ্যই আসেনি। সে গভীর রাতে আমার মেসবাড়িতে উপস্থিত হবে না। রাত অনেক। আমি ঘুমুতে গেছি এগারোটার দিকে। দু-তিন ঘণ্টা নিশ্চয়ই ঘুমিয়েছি। অবশ্যই রাত একটার বেশি। প্রসেস অব এলিমিনেশন পদ্ধতিতে রূপা বাতিল। শুধু রূপা না, পুরো মহিলাজাতিই বাতিল। কোনো মহিলাই রাত একটায় মেসে উপস্থিত হবে না।

বাকি থাকল পুরুষ। এমন কোনো পুরুষ এসেছে যে গায়ে আফটার শেভ লোশন দিয়েছে, কিংবা সেন্ট দিয়েছে। খালুসাহেব গায়ে সেন্ট দেন। বাদলের সমস্যা নিয়ে গভীর রাতে আমার কাছে তিনি উপস্থিত হতে পারেন। তবে তিনি চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকার লোক না। তা ছাড়া ঘর

অন্ধকার। তিনি ঘরে ঢুকেই বাতি জ্বালাবেন। প্রসেস অব এলিমেনশন পদ্ধতিতে তিনিও বাতিল।

এমন কেউ আমার বিছানার কাছে বসে আছে, যে বাতি জ্বালানোর ব্যাপারে আগ্রহী না। অর্থাৎ, সে নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চাচ্ছে। এমন লোক কে হতে পারে? আঙুল-কাটা জগলু ভাই? উনি কি গায়ে সেন্ট দেন?

আমি চোখ না মেলেই বললাম, জগলু ভাই, কখন এসেছেন?

চেয়ারে বসে-থাকা মানুষটা জবাব দিল না। তবে সিগারেট ধরাল। তামাকের গন্ধ পেলাম।

তোমার ঘর সবসময় খোলা থাকে?

জি।

আমার জিনিস কোথায়?

আমি উঠে বসতে বসতে বললাম, সুটকেসের কথা বলছেন? চৌকির নিচে আছে। হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিন।

পঁচিশ লক্ষ টাকাভরতি সুটকেস তুমি চৌকির নিচে রেখে দিয়েছ। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ পর্যন্ত করনি। এটা আমাকে বিশ্বাস করতে বলছ?

হ্যাঁ, বলছি। যা চলে যাবার সেটা যাবেই। হাজার চেষ্টা করেও ধরে রাখা যাবে না। মনসুর সাহেব তাঁর টাকাপয়সা ব্যাংকে রাখেন। তার পরও সেখান থেকে পঁচিশ লক্ষ টাকা বের হয়ে গেল না?

টাকা ঠিকঠাক আছে?

আছে বলেই তো মনে হয়। আমি গুনে দেখিনি। বাতি জ্বালাই, গুনে দেখুন।

বাতি জ্বালাতে হবে না।

আপনি মেসে ঢুকেছেন কীভাবে? কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেনি?

দারোয়ান জিজ্ঞেস করেছিল কোথায় যাব। তোমার কথা বলেছি, দরজা খুলে দিয়েছে।

আপনি কি একা এসেছেন?

একা আসি নাই। আমি একা ঘোরাফেরা করি না।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম , আমরা পৃথিবীতে আসি একা,

পৃথিবী থেকে ফেরত যাই একা, কিন্তু পৃথিবীতে ঘোরাফিরা করি অনেককে নিয়ে।

এই ধরনের সস্তা ফিলসফি আমার সঙ্গে কপচাবে না। এইসব থার্ড রেট কথাবার্তা আমি জানি।

বাতিটা জ্বালাই, জগলু ভাই। মুখ দেখতে পাচ্ছি না বলে কথা বলে আরাম পাচ্ছি না। তা ছাড়া সুটকেসের টাকাও আমাদের গোনা দরকার। পঞ্চাশটা পঞ্চাশ হাজার টাকার বান্ডিল থাকার কথা।

জগলু ভাই কিছু বললেন না। আমি বাতি জ্বালালাম। সুটকেস খুলে টাকার বান্ডিল গুনলাম। জগলু ভাই কোনো কথা বলছেন না। তিনি তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। টাকার পরিমাণ ঠিক আছে কি না, এই বিষয়ে তাঁর কোনো আগ্রহ দেখা গেল না।

হিমু!

জি জগলু ভাই?

তোমার সম্পর্কে আমি কিছু খোঁজখবর নিয়েছি। তোমাদের মেসের দারোয়ানকেও জিজ্ঞেস করলাম। বেশির ভাগ মানুষের ধারণা, তুমি সাধু-সন্ন্যাসী টাইপ কেউ। তুমি নাকি ভবিষ্যৎ বলতে পার। আমার ভবিষ্যৎ কী বলো দেখি।

আমি কয়েক সেকেন্ড চোখ বন্ধ করে রাখলাম। তারপর চোখ খুলে বড় করে নিশ্বাস নিয়ে বললাম, আপনি পুলিশের হাতে ধরা পড়বেন। তারপর ফাঁসিতে ঝুলবেন।

জগলু ভাই বিরক্ত গলায় বললেন, আমি যে ফাঁসিতে ঝুলব এটা বলার জন্য সাধু-সন্ন্যাসী, পীর-ফকির হওয়া লাগে না। যে-কেউ বুদ্ধিমান মানুষ বলতে পারবে যে, আমাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে।

আমি বললাম, কবে ধরা পড়বেন সেটা কিন্তু যে-কোনো মানুষ বলতে পারবে না।

তুমি বলতে পারবে?

অবশ্যই।

কবে?

সেপ্টেম্বরের এগারো তারিখ।

জগলু ভাই হতভম্ব গলায় বললেন, সেপ্টেম্বরের এগারো তারিখ?

আমি বললাম, জি। আপনার ছেলের জন্মদিন।

ছেলের জন্মদিন করতে গিয়ে আমি পুলিশের হাতে ধরা খাব?

জি।

এত সহজ হিসাব?

জি, হিসাব সহজ।

জগলু ভাই হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে নতুন আরেকটি ধরালেন। চেয়ার টেনে আমার দিকে খানিকটা ঝুঁকে এলেন। গুছিয়ে কোনো কথা বলার প্রস্তুতি। বেশির ভাগ মানুষই গুছিয়ে কথা বলার সময় শ্রোতার দিকে খানিকটা এগিয়ে আসে।

হিমু, আমাকে তোমার কী মনে হয়? বোকা না বুদ্ধিমান?

বুদ্ধিমান।

কীরকম বুদ্ধিমান?

আপনার বুদ্ধি বেশ ভালো।

একজন বুদ্ধিমান মানুষ, যে জানে তার ছেলেকে সবসময় পুলিশ নজরে রাখছে, সে কি তার ছেলেকে দেখতে যাবে?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, বড় বোকামিগুলি বুদ্ধিমান মানুষরাই করে।

জগলু ভাই সুটকেস-হাতে উঠে দাঁড়ালেন। আমি বালিশের নিচ থেকে মোবাইল সেট বের করে উনার দিকে এগিয়ে দিলাম। জগলু ভাই বললেন, এটা তুমি রেখে দাও। এটা তোমার গিফট।

আমি বললাম, গিফট আমি নেই না, জগলু ভাই। গিফট নেয়া আমার ওস্তাদের নিষেধ আছে।

কে তোমার ওস্তাদ?

আমার বাবা। তিনি বলে গিয়েছেন, হিমালয়, কাউকে কিছু দিবি না, কারো কাছ থেকে কিছু নিবিও না। নিজেকে সবরকম দেয়া-নেয়ার বাইরে রাখবি। উপহার দেয়া-নেয়া, প্রেম দেয়া-নেয়া কিংবা স্নেহ-মমতা দেয়া-নেয়া কোনোকিছুর মধ্যেই থাকবি না।

জগলু ভাই মোবাইল টেলিফোন হাতে নিলেন। প্যান্টের পকেটে রাখলেন আর তখনই মোবাইল বেজে উঠল। আমি বললাম, জগলু ভাই,

আপনার ছেলে টেলিফোন করেছে। সে প্রায়ই গভীর রাতে টেলিফোন করে। দেখি, শেষবারের মতো তার সঙ্গে কথা বলি।

জগলু ভাই বললেন, আমি যে এখানে আছি সেটা বলবে না। খবরদার!

হ্যালো, হিমু চাচু!

হ্যালো, বাবু।

কেমন আছ, হিমু চাচু?

ভালো আছি। তুমি কেমন আছ?

আমিও ভালো আছি। হিমু চাচু, তুমি কী করছ?

তোমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছি।

আমিও তোমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছি। হি হি হি।

জগলু ভাই আমার কানের কাছে তাঁর মাথা নিয়ে এসেছেন। কী কথাবার্তা হয় শুনতে চাচ্ছেন। মোবাইল-নামক যন্ত্রের ভল্যুম বাড়ানোর ব্যবস্থা আছে। কাজটা কীভাবে করা হয় আমি জানি না। জানলে ভল্যুম বাড়িয়ে দিতাম, তাতে জগলু ভাইয়ের সুবিধা হতো। ছেলের প্রতিটি কথা পরিষ্কার শুনতে পেতেন।

হিমু চাচু!

বলো, শুনছি!

আমাকে তুমি যে ভূতের বাচ্চাটা দিয়েছ তার নাম হলো 'হং'।

তুমি নাম দিয়েছ?

না। ও আমাকে বলেছে।

তোমার সঙ্গে কি ওর কথা হয়?

হয়। রোজ রাতে সে কথা বলে।

কী কথা বলে?

অনেক কথা বলে। বাবার কথা বলে।

বাবার কথা কী বলে?

বাবা কোথায় আছে, কী করছে—এইসব বলে।

ভূতের বাচ্চাটাকে জিজ্ঞেস করো তো এখন তোমার বাবা কোথায় আছে।

সেটা তো আগেই জিজ্ঞেস করেছি।

হং কী বলেছে?

বলেছে, বাবা তোমার সঙ্গে আছে।

কথা বলবে বাবার সঙ্গে?

না। আমি এখন ঘুমাব।

বাবার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছ না কেন?

হং নিষেধ করেছে।

কেন নিষেধ করেছে?

হং বলেছে, আমি যদি অনেক দিন বাবার সঙ্গে কথা না বলি তা হলেই জন্মদিনে বাবা আমাকে দেখতে আসবে। কথা বললে আসবে না। আমি এখন আর তোমার সঙ্গে কথা বলব না। আমি ঘুমাব।

জগলু ভাই এখন বসে আছেন। মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। আমি জগলু ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, আর রাত করে লাভ কী? চলে যান।

জগলু ভাই বললেন, ভূতের বাচ্চার ব্যাপারটা কী?

আমি বললাম, কোনো ব্যাপারই না। একটা সবুজ বোতলে আমি কিছু সিগারেটের ধোঁয়া ভরে দিয়ে দিয়েছি।

ভূতের বাচ্চা কথা বলছে, এই রহস্যটা কী?

শিশুমনের কল্পনা। এর বেশি কিছু না।

আমি যে তোমার সঙ্গে আছি সেটা কীভাবে বলল?

কাকতালীয় ব্যাপার। লেগে গেছে। জগৎসংসারে কাকতালীয় ব্যাপার ঘটে। ভালোমতো চিন্তা করে দেখুন, আপনার জীবনেও অনেকবার ঘটেছে।

জগলু ভাই উঠে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, সুটকেস ফেলে যাচ্ছেন।

জগলু ভাই বললেন, এত রাতে টাকা নিয়ে বের হব না। থাকুক তোমার কাছে। পরে একসময় এসে নিয়ে যাবে।

আমি বললাম, তা হলে একটা কাজ করি, সুটকেসটা নিরাপদে থাকে এমন একটা জায়গায় রেখে দেই। আবার মনসুর সাহেবের কাছে দিয়ে আসি?

জগলু ভাইয়ের ঠোঁটে এই প্রথম সামান্য হাসির আভাস দেখলাম। তিনি হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না।

আমি বললাম, শুভ্র কেমন আছে?

জগলু ভাই বললেন, শুভ্র কেমন আছে আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন?

আপনাকে জিজ্ঞেস করছি কারণ আমার ধারণা আপনি তার খোঁজ খবর নেন।

শুভ্র ভাল আছে।

আমি বললাম, জগলু ভাই আমার ধারণা আপনার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। আপনি কি ঐ ধাধার উত্তরটা জানতে চান। ঐ যে কোন সে প্রাণী খাদ্য গ্রহণ করে না...।

উত্তর জানতে চাই না। উত্তর আমি নিজে নিজে বের করব।

সহজ লাইনে চিন্তা করবেন জগলু ভাই। সমস্যা যত জটিল তার সমাধান তত সহজ। অতি জটিল যে জীবন তার ব্যাখ্যা সেই কারণেই অতি সহজ।

ব্যাখ্যা কি?

আপনি এই ধাধাটার জবাবও নিজেই বের করুন। আপনি দীর্ঘ সময় জেগে থাকবেন ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার সুযোগ পাবেন।



সাত.

মিতুরা কানাডায় চলে যাবে। আমি শেষ দেখা করতে গেছি। মিতু আমাকে দেখেই বলল, একা এসেছেন? না ঠেলাগাড়িতে নতুন কোনো ডেডবডি আছে?

আমি বললাম, একা।

মিতু বলল, এখন আর আপনাকে একা মানায় না। দু'একটা ডেডবডি সঙ্গে না থাকলে আপনি কিসের হিমু?

মিতুকে খুব আনন্দিত লাগছে। তার আনন্দের কারণটা ধরতে পারছি না। আমার ক্ষীণ সন্দেহ হল সে আমাকে দেখেই আনন্দিত।

তারপর হিমু সাহেব এসেছেন কি জন্যে? টাকার ব্যাগ নিয়ে যেতে?

হুঁ।

আমিও তাই ভাবছিলাম। আমাদের বিদায় দিতে আসার মানুষ আপনি না। আপনার দরকার টাকা। স্যুটকেস এখনি দিয়ে দেব না-কি আগে এক কাপ চা খাবেন?

চা খেতে পারি।

আপনার অসীম দয়া। আমার মত অভাজনের সঙ্গে চা খেতে রাজি হয়েছেন। নিজের সৌভাগ্যে নিজেরই ঈর্ষা হচ্ছে।

তোমরা যাচ্ছ কবে?

পরশু সকালে।

তাহলে বাংলাদেশ বিদায়?

হ্যাঁ বাংলাদেশ বিদায়। দেশ নিয়ে আপনারা থাকুন। ভাল কথা তিন

মিনিট একা বসে থাকতে পারবেন? আপনার চা-টা আমি নিজের হাতে বানাবো।

কেন?

আমার ইচ্ছা।

তোমার বাবা কোথায়?

জানি না কোথায়। ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছেন তো— দম ফেলার সময় পাচ্ছেন না।

মিতু চা এনে সামনে বসল। আমি এক চুমুকে চা শেষ করে বললাম, উঠি?

মিতু তাকিয়ে আছে কিছু বলছে না। আমার ব্যবহারে সে যে প্রচণ্ড আহত হয়েছে সেটা বুঝতে পারছি। সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, টাকার স্যুটকেস নিয়ে যান।

আমি বললাম, স্যুটকেসের দরকার নেই।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। মিতু বলল, আপনি বসুন। আপনি যেতে পারবেন না। বসুন বললাম।

আমি বসলাম।

মিতু বলল, এখন বাজে এগারোটা। আপনি দুপুর পর্যন্ত থাকবেন এবং দুপুরে আমার সঙ্গে ভাত খাবেন।

আমার জরুরি কাজ ছিল মিতু।

আপনার কোনো জরুরি কাজ নেই। বেকার মানুষদের জরুরি কাজ থাকে না। বেকাররা যা করে তা হল জরুরি কাজের ভান করে— ঘোরাঘুরি।

দুপুরে কী খাওয়াবে?

আপনি যা খেতে চাইবেন তা-ই খাওয়াব। তাই বলে উদ্ভট কিছু চাইলে তো খাওয়াতে পারব না। এখন আপনি যদি ময়ূরের মাংসের কাবাব আর হরিণের কলিজা ভুনা খেতে চান তাহলে পারব না। বলুন কী খাবেন? সহজ কিছু খেতে চান যেন আমি নিজে হাতে রেঁধে আপনাকে খাওয়াতে পারি।

পোলাউর চালের ভাত। ঘন ডাল। দেশী মুরগীর ডিমের ঝোল, কই মাছ ভাজা, ইলিশ মাছের ডিমের ভুনা। সঙ্গে থাকবে আমের আচার।

খাওয়ার শেষে বগুড়ার দৈ।

মিতু হাসছে। সে হাসতে হাসতেই বলল, আপনার ভাব-ভঙ্গি দেখে কখনো মনে হয় না আপনি কোনদিন বিয়ে করবেন। যদি কখনও বিয়ে করতে ইচ্ছা হয় আমাকে জানাবেন। আমি একটা মেয়ে দেখে রেখেছি সে আপনার জন্যে পার্ফেক্ট হবে। রূপবতী মেয়ে, শুধু রূপবতীই না, বুদ্ধিমতীও। মেয়েটার প্রচুর টাকা। আপনার মত ভ্যাগবণ্ডের এরকম বউই দরকার।

আমি বললাম, মেয়েটার চিবুকে কি তিল আছে?

মিতু তার চিবুকের তিল বাঁ হাতে ঢেকে সহজ গলায় বলল, হ্যাঁ আছে। খুব বেহায়ার মতই কথাটা বললাম। আপনার কি মেয়ে পছন্দ হয়েছে?

আমি বললাম, অবশ্যই পছন্দ হয়েছে। চল যাই।

মিতু বলল, চল যাই মানে? কোথায় যাই?

কাজি সাহেবের কাছে যাই। ঝামেলা শেষ করে আসি।

মিতু বলল, সব কিছুই আপনার কাছে ঠাট্টা?

আমি বললাম, তুমি যদি আমার মত সবকিছু ঠাট্টা হিসেবে নাও তা হলে দেখবে জীবন ইন্টারেস্টিং।

মিতু বলল, আমি যখন একটা খুন করব তখন ভাবব এটা ঠাট্টা? আবার যখন খুনীর দায়ে ফাঁসিতে ঝুলব সেটাকেও ভাবব ঠাট্টা?

মিতু রাগে কাঁপছে। আমি তার রাগ দেখে মজা পাচ্ছি। মেয়েটা এত রাগল কেন?

মিতু বলল, আপনি হাসছেন কেন?

হাসব না?

না হাসবেন না। এবং আপনি চলে যাবেন।

দুপুরে যে খাবার দাওয়াত ছিল সেটা বাতিল।

হ্যাঁ বাতিল। ধরে নিন আমি আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করেছি।

আচ্ছা যাও ধরে নিলাম। বিদায়।

হ্যাঁ বিদায়।

আপনাকে ছোট্ট একটা অনুরোধ করব। রাখবেন? প্লীজ।

অনুরোধ কর। রাখব।

মিতু বলল, আমার ধারণা আপনি এই বাড়ি থেকে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মন খারাপ হয়ে যাবে। ফিরে আসার জন্যে আমি আপনাকে টেলিফোনের পর টেলিফোন করতে থাকব। আপনার প্রতি আমার এই অনুরোধ আপনি টেলিফোন ধরবেন না। আর যদি ধরেনও ফিরে আসবেন না। ঠিক আছে?

হ্যাঁ ঠিক আছে।

প্রমিজ?

হ্যাঁ প্রমিজ।

আমি পার্কে বসে আছি। দ্যা গ্রেট জিতু মিয়া মাথা মালিশ করে দিচ্ছে। শুধু যে মাথা মালিশ করছে তাই না—

গানও শুনাচ্ছে। সবই সিনেমার গান। কোন ছবিতে গানটা আছে, কোন নায়িকা গান গেয়েছেন গানের আগে সেই ধারাভাষ্যও আছে।

ওস্তাদ এখন যে গানটা করব এইটা রিয়াজ ভাই গাইছে।

রিয়াজ ভাই কি সিনেমা লাইনের কেউ?

অবশ্যই। হিট হীরু। ছবির নাম দুই দুয়ারী।

নাম তো খারাপ না।

নাম খারাপ না হইলেও ছবি খারাপ। ফিনিসিং নাই। এক হিরুইন ডাবল হীরু। ডাবল হীরুর ছবি ভাল হয় না।

তাই না-কি?

সিঙ্গেল হীরুইন ডাবল হীরুর সব ছবি ফ্লপ হইছে।

কারণটা কি?

আল্লাপাকের ইশারা হইতে পারে। আল্লাপাকে ডাবল জিনিস পছন্দ করে না। উনার পছন্দ সিঙ্গেল। ঠিক না?

ঠিক হতে পারে। তুই গান শোনা।

মিতু মিয়া গান ধরার আগেই টেলিফোন বাজল। মিতু টেলিফোন করেছে।

হ্যালো মিতু! কেমন আছ?

জ্বি ভাল আছি।

দুপুরের রান্না হয়ে গেছে।

জ্বি হয়েছে।

নিজের হাতেই রেঁধেছ?

হ্যাঁ।

যে সব আইটেম বলেছিলাম, সব রান্না হয়েছে।

শুধু ইলিশ মাছের ডিমটা হয়নি। হিমু সাহেব শুনুন আপনাকে কি বলেছি সেটা মাথায় রাখবেন না। আমি হাত জোর করছি আপনি চলে আসুন। রান্না-বান্নার অভ্যাস আমার নেই— তারপরেও প্রতিটি আইটেম আমি রান্না করেছি। আপনি কোথায় আছেন বলুন আমি গাড়ি নিয়ে এসে আপনাকে বাড়িতে নিয়ে যাব। আপনি কোথায়?

আমি যে জায়গায় আছি পার্শি ভাষায় তাকে বলে— পারিদায়েজা। পারিদায়েজা হচ্ছে চমৎকার বাগান। যে বাগানে পাখি গান করে। প্যারাডাইজ শব্দটা এসেছে পারিদায়েজা থেকে।

আপনি আসবেন না?

আমি টেলিফোন বন্ধ করে দিয়ে জিতু মিয়ার দিকে তাকিয়ে বললাম, গান শুরু কর।

পরিশিষ্ট

দুবছর পরের কথা। দুবছরে কী কী ঘটল তার সংক্ষিপ্তসার।

ক.

খালুজান ঠিক করেছেন বাদলের বিয়ে দেবেন। তাঁর ধারণা, বিয়ে হলো বাদলের একমাত্র ওষুধ। সেই ওষুধের ব্যবস্থা হয়েছে। যে-মেয়েটির সঙ্গে বিয়ের কথা মোটামুটিভাবে পাকা হয়েছে তার নাম আফরোজা। হোম ইকোনমিক্সে পড়ে। তার হাসি-সমস্যা আছে। তাকে যা-ই বলা হয় সে হাসে। বাদল তাকে যখন মতি মিয়ার গল্প বলেছে, তখনো নাকি ভয় পাওয়ার বদলে সে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে ভেঙে পড়েছে। এই ব্যাপারটা নিয়ে বাদল চিন্তিত। আমার কাছে পরামর্শের জন্য এসেছিল। আমি তেমন কিছু বলতে পারিনি।

বাদল আহত গলায় বলল, এমন ভয়ঙ্কর ভৌতিক কাহিনী শুনলে গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যাবার কথা, অথচ আফরোজা হাসছে। এর মানে কী, হিমু ভাইজান?

আমি বললাম, মেয়েটা মনে হয় তোর কথা বিশ্বাস করেনি।

কী করা যায় বলো তো?

যেখানে আমরা মতির ডেডবডি ফেলে এসেছিলাম, সেখানে তাকে নিয়ে যা। সন্ধ্যাবেলা নিয়ে যাবি। নতুন পরিবেশে গল্পটা আবার বলে দ্যাখ। ভৌতিক গল্পে পরিবেশ খুবই ইম্পর্টেন্ট।

আমি একা তাকে ওই জায়গায় নিয়ে যাব? অসম্ভব। তুমি সঙ্গে গেলে যেতে পারি।

তোদের মাঝখানে আমার কি হাইফেন হিসেবে থাকা ঠিক হবে?

অবশ্যই ঠিক হবে। তা ছাড়া 'আফ' তোমাকে দেখতে চায়।

'আফ'টা কে?

বাদল লজ্জিত গলায় বলল, আফরোজাকে আমি সংক্ষেপে 'আফ' বলি। নামটা ভালো হয়েছে না?

তোকে সে সংক্ষেপ করে কী ডাকে? বাদল সংক্ষেপে হয় 'বাদ'। তোকে কি 'বাদ' ডাকে?

বাদল হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। তাকে খুবই আনন্দিত মনে হলো।

এক সন্ধ্যায় 'বাদ' এবং 'আফ'কে নিয়ে উপস্থিত হলাম মাওনায়।

সেখানে রাস্তার পাশে বাঁধানো কবর, দানবাক্স, শালু কাপড়ের চাদর, মোমবাতি—সবই পাওয়া গেল। জানা গেল কবরটা অচিন পীরের। পীরসাহেব খুবই গরম। তিনি বেয়াদবি সহ্য করেন না। তবে খাস দিলে কেউ কিছু চাইলে অচিন বাবার সুপারিশে তা পাওয়া যায়। হুজরাখানার খাদেমের সঙ্গেও কথা হলো। খাদেমের নাম মুনশি খলিলুল্লা। খাদেম যা বললেন তা হলো, বছর দুই আগে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে এক নুরানি চেহারার মানুষ তাকে বলছেন, ওরে, রাস্তার পাশে আমি শুয়ে আছি। তুই আমাকে কবর দে। এইখানে মাজার হোক। তুই তার প্রধান খাদেম।

আমি বললাম, মাজারের আয়-রোজগার কেমন?

খাদেম সাহেব বললেন, আয় ভালো। সব বাস এখানে থামে। যাত্রীরা দান-খয়রাত করে। শহর-বন্দরেও খবর পৌঁছে গেছে। শহর-বন্দর থেকে লোকজন আসে। এই যেমন আপনারা এসেছেন।

আমি বললাম, উরস হয় না?

খাদেম উৎসাহিত গলায় বললেন, উরস আগে হতো না, তবে গত শবেবরাতে অচিন বাবা আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে উরস করতে বলেছেন। বাবার ওফাতের দিন এখন থেকে উরস হবে।

অচিন বাবার আসল নাম জানেন?

উনার আসল নাম, নকল নাম একটাই—অচিন বাবা।

আমি অচিন বাবার উরসের জন্য দানবাক্সে একশো টাকা দিলাম।

খ.

মনসুর সাহেব তাঁর কন্যাকে নিয়ে কানাডায় সেট্‌ল্‌ করেছেন। দুজনই ভালো আছেন বলে আমার ধারণা। মিতু প্রতিমাসে একটি করে চিঠি পাঠাচ্ছে। চিঠিতে সে কী বলতে চায় তা আমার কাছে স্পষ্ট না। একটা চিঠি নমুনা হিসেবে দিয়ে দিচ্ছি :

হিমু সাহেব।

কেমন আছেন আপনি? নিশ্চয়ই ভালো আছেন। আপনি খারাপ থাকার মানুষ না। দেশের বাইরে পা দেবার পর থেকে মনে হচ্ছে বিরাট ভুল করেছি। দেশে থাকার সময় আপনার সঙ্গে আরো ভালো করে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

আপনি মোটামুটি ইন্টারেস্টিং একজন মানুষ, এইজন্যই আপনার প্রতি আমার সামান্য কৌতূহল।

পঁচিশ লক্ষ টাকা নিয়ে বাবা একধরনের কনফিউশন ভোগ করছেন। তিনি কোনো এক বিচিত্র কারণে টাকাটা রাখতে চাচ্ছেন না। জনহিতকর কোনো কাজে তিনি টাকাটা খরচ করতে চান। এই ব্যাপারে বাবা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

এখানকার বাংলা পত্রিকায় দেখলাম শীর্ষ সন্ত্রাসী আঙুল-কাটা জগলু তার ছেলের জন্মদিন পালন করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। আপনার কি মন খারাপ? আপনার এত প্রিয়জন! জিগরি দোস্ত। বদমাশটার কি সত্যি কোনো বিচার হবে? বাংলাদেশের যে-অবস্থা দেখা গেল, কোর্ট থেকে জামিনে ছাড়া পেয়ে সমানে খুন-খারাবি করে যাচ্ছে। আপনিও সঙ্গে আছেন এবং ওস্তাদ ওস্তাদ ডেকে যাচ্ছেন।

আপনি কি এই চিঠিটার জবাব দেবেন? আমি পরিষ্কার

বুঝতে পারছি চিঠির জবাব না- দেয়া আপনার বিশেষ এক স্টাইল। আপনি থাকুন আপনার স্টাইল নিয়ে। আমার যখন ইচ্ছা হবে তখনই আমি আপনাক চিঠি লিখব। এবং সামারে টিকিট পাঠাব যেন আমাদের এসে দেখে যেতে পারেন।

কয়েক দিন আগে স্বপ্নে দেখলাম, আপনি ছুরি দিয়ে আমার একট আঙুল কেটে দিয়েছেন। কে জানে এমন অদ্ভুত স্বপ্ন কেন দেখলাম! স্বপ্নে খুবই ভয় পেয়েছিলাম, তবে স্বপ্ন ভাঙার পর অনেকক্ষণ হেসেছি।

এখন থেকে আমি আপনাকে ডাকব—আঙুল-কাটা হিমু।

ইতি
মিতু

পুনশ্চ : আমি সাংকেতিক ভাষায় আপনাকে একটা বিষয় জানাচ্ছি, দেখি আপনি ধরতে পারেন কি না।

একটা পাখি, চারটা পাখি, তিনটা পাখি।

গ.

আঙুল-কাটা জগলু ভাইয়ের ফাঁসির হুকুম হয়েছে। প্রেসিডেন্টের কাছে মার্সি পিটিশন করা হয়েছিল। লাভ হয়নি। ফাঁসির তারিখ হয়েছে। জগলু ভাইকে তারিখ জানানো হয়নি। এর মধ্যে একদিন তাঁকে দেখতে গেলাম। তিনি খুবই উত্তেজিত গলায় বললেন, বাবুর অসুখ যে ভালোর দিকে এটা শুনেছ?

আমি বললাম, শুনেছি।

বোনম্যারো ট্রান্সপ্যান্ট শেষ পর্যন্ত মনে হয় কাজ করতে শুরু করেছে।

আমি বললাম, প্রকৃতির কর্মকাণ্ড চট করে বোঝা যায় না। তার প্যাঁচ অতি জটিল। আপনিও ধরা পড়লেন, তার অসুখও সারতে শুরু করল।

জগলু ভাই বললেন, তোমার ঐ ধাঁধার জবাব এখনও বের করতে পারি নি।

বলে দেব?

না। দেখি নিজেই বের করতে পারি কি-না। সেলে বসে থাকি চিন্তা করা ছাড়া কিছু করার নেই। ভাল কথা শুভ্র কেমন আছে?

ভাল।

তাকে একদিন নিয়ে আসব?

দরকার নেই। সিগারেট এনেছ?

দাও সিগারেট খাই।

আমরা দুজন সিগারেট ধরালাম। জগলু ভাই বললেন, তোমাকে চিন্তিত লাগছে কেন? কোনো বিষয় নিয়ে কি চিন্তিত?

আমি বললাম, একটা ধাঁধার রহস্য উদ্ধার করতে পারছি না।

কী ধাঁধা বলো তো?

একটা পাখি, চারটা পাখি, তিনটা পাখি।

জগলু ভাই বললেন, খুব সহজ ধাঁধা। একটা পাখি মানে হলো একটা অক্ষর। চারটা পাখি চারটা অক্ষর। তিনটা পাখি তিনটা অক্ষর। I love you।

জগলু ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসছি, তিনি পেছন থেকে ডাকলেন। সহজ গলায় বললেন, হিমু, মনে হয় তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।

আমি বললাম, আমারও সেরকম মনে হচ্ছে।

জগলু ভাই বললেন, তোমাকে শেষ কথাটা বলি—একটা পাখি, চারটা পাখি, তিনটা পাখি।
